মানসিক স্বাস্থ্য

ভালো রাখবেন কীভাবে

OYSTER
Helping Hands for Humanity

অয়েস্টার ইন্ডিয়া

মানসিক স্বাস্থ্য

ভালো রাখবেন কীভাবে

লেখকঃ

ডা. জাকির হোসেন লস্কর

অয়েস্টার ইন্ডিয়া

মানসিক স্বাস্থ্য ভালো রাখবেন কীভাবে

প্রথম প্রকাশ ঃ এপ্রিল, ২০১৯

Second Edition (e-Book) : June, 2021

প্রকাশক ঃ অয়েস্টার ইন্ডিয়া

পি-৩, নিউ সি.আই.টি রোড, ফার্স্ট ফ্লোর,
রুম নং-১০১, থানা - বউবাজার,
কলকাতা - ৭০০০৭৩, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
ফোন ঃ ৯৮৩৬৯১৩০১৮
ই-মেল ঃ oysterindiatrust@gmail.com
ওয়েবসাইট ঃ www.oysterindiatrust.com

লেখক পরিচিতি ঃ

ডা. জাকির হোসেন লস্কর, পি.এইচ.ডি
স্নায়ু-মনোরোগ বিশেষজ্ঞ (হোমিওপ্যাথি), যোগাযোগ ঃ ৯৮৩১১৪৮১১২
ওয়েবসাইট ঃ www.brainmindiaclinic.com

কম্পোজিং ঃ মা শিবানী ডি.টি.পি সেন্টার, কলকাতা - ৭০০১৫০

পুস্তিকাটি সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে অয়েস্টার ইন্ডিয়া কর্তৃক
জনস্বার্থে প্রচারিত ও বিনামূল্যে বিতরিত।

লেখকের কথা

নৈতিক অধঃপতনের কারণেই আজ মানসিক স্বাস্থ্য বিপন্ন। সামাজিক মূল্যবোধের সংকট ও সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে লড়াই করে সমগ্র জাতির মানসিক স্বাস্থ্যকে সুরক্ষিত রাখার শপথ নেবার দিন এসেছে আজ। মনোবিদ, মনঃচিকিৎসক ও মানসিক স্বাস্থ্যকর্মীদের সাথে সমাজ-সচেতন নাগরিক হিসাবে আমরা সবাই যদি কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এ লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করি, তবেই মানসিক স্বাস্থ্য-আন্দোলন পূর্ণতা পাবে।

ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অফ মেন্টাল হেল্‌থ-এর তৎকালীন ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল, রিচার্ড হান্টার-এর উদ্যোগে ১৯৯২ সালে প্রথম মানসিক স্বাস্থ্য-দিবস পালন করা হয়। মানসিক স্বাস্থ্য-বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধিতে ও বিবিধ মনোবিকারের নিরসনকল্পে এই সাধু উদ্যোগ গৃহীত হয়েছিল। প্রথম দিকে নির্দিষ্ট কোনো বিষয়বস্তু ছাড়াই এই দিনটি পালিত হোত। ১৯৯৬ সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে বিষয়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাকে থিম্ করে সারা বিশ্বে এই দিনটি সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হয়ে আসছে। ২০১৮ সালের বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্যদিবসের শ্লোগান ছিল –''ইয়ং পিপল্ অ্যান্ড মেন্টাল হেল্‌থ ইন আ চেঞ্জিং ওয়ার্ল্ড'' অর্থাৎ পরিবর্তিত বিশ্ব-পরিস্থিতিতে কিভাবে যুবসমাজের মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখা যায়। আজ দেশে দেশে শিক্ষিত বেকারদের বৃহত্তর অংশ মদ ও মারণ-নেশায় আসক্ত হয়ে পড়ছে। ছাত্র-যুবসমাজের এক বড়ো অংশ সোশ্যাল মিডিয়ায় আক্রান্ত হয়ে পড়ছে। কিশোর-কিশোরীদের ইন্টারনেটে পর্ণোগ্রাফি অ্যাডিকশন বর্তমানে অভিভাবকগণের প্রবল মাথাব্যথার কারণ। নৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের ফলস্বরূপ কিশোর-কিশোরী ও তরুণ-তরুণীরা বিকৃত মানসিকতার শিকার হয়ে পড়ছে। চারপাশের অসুস্থ মানসিক পরিবেশের প্রভাবে তাদের মধ্যে দেখা দিচ্ছে ঘৃণা, হিংসা-বিদ্বেষ, মারাত্মক রাগ ও অন্যান্য নানান মনোবিকার। এর চরম পরিণতিতে যৌবনের ঊষালগ্নে কেউ বা পা রাখছে অন্ধকার অপরাধ জগতে, কেউ বা আবার চূড়ান্ত নিরাশা থেকে মানসিকভাবে অবসাদগ্রস্থ হয়ে পড়ছে।

সমাজের সর্বস্তরে আদর্শ চিন্তা-চেতনার অভাব ও রাহুগ্রস্থ নৈতিকতা আমাদের মানসিক শক্তিকে ক্রমাগত নিঃশেষিত করে দিচ্ছে। ধর্মীয়, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রভাব-জনিত মানসিক চাপে আমরা অনেকেই আজ মানসিক অবসাদের শিকার হয়ে পড়ছি। এছাড়া, অপরিসীম দারিদ্র, ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যা, দাম্পত্য জীবনে পারস্পরিক বিশ্বস্ততার অভাব ইত্যাদির কারণে আমাদের মানসিক স্বাস্থ্য ভগ্নদশাগ্রস্ত। ব্যক্তি মানুষের উচ্চাভিলাষের সাথে তাঁর প্রকৃত

সামর্থ্যের অসামঞ্জস্যতা তাঁকে মানসিকভাবে অসুস্থ করে তুলেছে। ঘরে-বাইরে সুস্থ মানবিক সম্পর্কের আজ বড়ই অভাব। ওয়ার্ল্ড হেল্‌থ অর্গানাইজেশন-এর তথ্যপ্রমাণ থেকে জানা যাচ্ছে, বর্তমানে বিশ্বের প্রায় ৪৮০ মিলিয়ন নারী-পুরুষ মানসিক চাপে বিপর্যস্ত ও ফলস্বরূপ মনোরোগের শিকার। জনসংখ্যার প্রতি ৪-৫ জনের মধ্যে ১ জন মানসিকভাবে অসুস্থ। সমাজ ও সভ্যতার বৃহত্তর কল্যাণের স্বার্থে এই সর্বগ্রাসী সংকটমোচনে আমাদের সবাইকে উদ্যোগী হতে হবে।

ডা. জাকির হোসেন লস্কর
সেক্রেটারী, অয়েস্টার ইন্ডিয়া

প্রকাশকের কথা

মানসিক স্বাস্থ্য যে আজ আর অবহেলার নয়, এটা বুঝলেই আমাদের সবার মঙ্গল। প্রতিরোধ সম্পর্কে সচেতনতা আমাদের মানসিক স্বাস্থ্য-সমস্যা বিষয়ক অনেক বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারে। দেশ ও সমাজের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের স্বার্থে এ ব্যাপারে অয়েস্টার ইন্ডিয়া-র উদ্যোগে এই পুস্তিকাটি প্রকাশিত হল। সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে জনস্বার্থে প্রচারিত এই পুস্তিকাটি বিনামূল্যে বিতরণ করা হবে।

ধন্যবাদান্তে,

অয়েস্টার ইন্ডিয়া-র পক্ষে –

Tapan Kr. Paul (President)
Nirmal Mondal (Publishing Head)
Payel Bose (Editor, Value Today)
Dhruba Jyoti Das (Associate Editor)

এপ্রিল, ২০২১
কলকাতা-৭০০০৭৩

মানসিক অবসাদ ঃ মুক্তি কিভাবে

সম্প্রতি প্রাপ্ত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরিসংখ্যান থেকে জানা যাচ্ছে, কমবেশী ৩০-৩৫ কোটি নারী-পুরুষ সারা বিশ্বে আজ মানসিক অবসাদের শিকার। মানবিক সম্পর্ক, আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের আশা-আকাঙ্খাগুলো সব ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে মানসিক অবসাদের চাপে। লেখাপড়ার চাপে আজ ছাত্র-ছাত্রীরা ক্লান্ত-অবসন্ন। আর জীবন ও জীবিকার চাপে তাদের বাবা-মায়েরাও আজ বিদ্ধস্ত এবং অবসাদগ্রস্থ। ডবলিউ.এইচ.ও.-র রিপোর্ট বলছে, ২০২০-২০২৫ সালের মধ্যে ইস্কেমিক হার্ট ডিজিজের পরে দ্বিতীয় স্থানটি দখল করে নেবে মানসিক অবসাদ বা মেন্টাল ডিপ্রেশান। ক্যানসার, এডস্ ইত্যাদি নানান মারণব্যাধির সাথে পাল্লা দিয়ে এদের সবাইকে হারিয়ে ২০৩৫ সালের মধ্যে এই মানসিক অবসাদ রোগের আনুপাতিক গুরুত্বের বিচারে প্রথম স্থান দখল করে নেবে। প্রতি বছর বিশ্বের প্রায় ১০-১২ লক্ষ মানুষ আত্মহত্যা করেন। আর আত্মহত্যার চেষ্টা করেন প্রায় ২ কোটি নরনারী। পরিসংখ্যান থেকে জানা যাচ্ছে, প্রত্যেক দিন প্রায় ৪-৫ হাজার মানুষ মানসিক অবসাদের কারণে আত্মহননের পথ বেছে নেন। মানসিক অবসাদ যে হারে মহামারীর আকার নিচ্ছে, দুনিয়াজোড়া সেই সংকটকে মাথায় রেখে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ২০১২ সালের বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য-দিবসের (১০ই অক্টোবর) স্লোগান রেখেছিল ‘‘ডিপ্রেশান—আ গ্লোবাল ক্রাইসিস।’’

মানসিক অবসাদের লক্ষণগুলো কি কি?

কারণে অকারণে মন খারাপ হওয়া, যখন-তখন নিজের ভিতরে অস্থিরতা, সব কিছুতেই উদ্যম-উৎসাহ হারিয়ে ফেলা বা অবাস্তব নেগেটিভ চিন্তা করা প্রভৃতি হল প্রাথমিক কিছু লক্ষণ। মানসিক অবসাদের কবলে পড়লে মানুষের আনন্দ পাবার অনুভূতি ভোঁতা হয়ে যায়, তখন আর কোনোকিছুই একদম ভালো লাগে না। দৈনন্দিন কাজকর্মের আগ্রহ কমে যায়, সব কিছুতেই চূড়ান্ত হতাশা প্রবলভাবে গ্রাস করে। তখন রোগীর মনের অবস্থা এতটাই নেতিবাচক হয়ে ওঠে যে তিনি বিশ্বাস করতে শুরু করেন, এই হতাশাব্যঞ্জক পরিস্থিতি থেকে তাঁর আর মুক্তি নেই। কারুর কারুর যেমন, আগের ভালো লাগা জিনিস এখন আর একদম ভালো লাগে না। প্রিয় বন্ধুদের তখন সে এড়িয়ে চলে, নিজের শখের জিনিসের প্রতি আর আগ্রহ থাকে না — প্রিয় টিভি সিরিয়ালগুলোও আর দু-দণ্ড দেখতেও বসে না। কারুর কারুর এমনকি জীবন সম্পর্কে চূড়ান্ত বিতৃষ্ণা তৈরী হয় বিষন্নতার কবলে পড়লে।

মেণ্টাল ডিপ্রেশানের প্রভাবে শারীরিক ও মানসিক আর কি কি পরিবর্তন হয়?

খাবার ইচ্ছা ও জল পিপাসা কমে যায়। সারাদিন শুয়ে-বসে কাটাতে মন চায়। রাতে ছটফট করে, ভালো করে ঘুমাতে পারে না। সবকিছুতেই খিটখিটে মেজাজ, বিরক্তিভাব,

ভিতরে ভিতরে চূড়ান্ত অস্থিরতা গ্রাস করে। অসম্ভব ক্লান্তিভাব, কোনো কাজে অনেকক্ষণ মনঃসংযোগ রাখতে পারে না। জীবনের ঠিকঠাক সিদ্ধান্ত নিতেও ভুল করে বসে। কেউ কেউ নিজেকে অপদার্থ ভাবতে শুরু করে। রোগী বিশ্বাস করতে শুরু করে, তারই দোষে সংসারের আজ এই হাল। সে ভাবতে থাকে, আমি মরে গেলে সংসারে সবার কল্যাণ হবে, মঙ্গল হবে। কেউ কেউ আবার মৃত্যুচিন্তায় উদ্বেল হয়ে ওঠেন। ভাবেন, কোনোমতে এ পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে পারলে আমার শান্তি। তিনি যখন অবসাদগ্রস্থ অবস্থা আর সহ্য করতে না পারেন, তখন তিনি সুইসাইডাল বা আত্মহত্যাপ্রবণ হয়ে পড়েন — আর তখন তাঁর অস্থিরভাব হঠাৎ করে স্তিমিত হয়ে আসে। তখন এমনকি তিনি নিজের প্রিয় জিনিসটিও অন্যকে ডেকে দিয়ে দেন।

অবসাদগ্রস্থ রোগীদের শতাংশের হার কেমন?

বয়ঃসন্ধিকালে ৮ থেকে ১০ শতাংশ ছেলে-মেয়ে মানসিক অবসাদের শিকার হয়। প্রাপ্তবয়স্কদের অবসাদে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা ১৫ থেকে ২০ শতাংশ। মনে রাখতে হবে, পুরুষদের থেকে মহিলাদের অবসাদগ্রস্থ হবার প্রবণতা বেশী থাকে। পরিসংখ্যান বলছে, প্রতি ৬ জন নারীর মধ্যে ১ জন, আর প্রতি ১০জন পুরুষের মধ্যে ১ জন ডিপ্রেশানে আক্রান্ত হয়। সারা জীবনে কোনোও না কোনো সময়ে অবসাদে আক্রান্ত হয়েছেন এমন মানুষের সংখ্যা ১৫ শতাংশেরও বেশী।

ডিপ্রেশান বা অবসাদ কত রকমের হয়?

নিজের একান্ত ব্যক্তিগত কারণে যে সাইক্লিক ডিপ্রেশান বা অবসাদমূলক বাতুলতা দেখা দেয় তাকে ডাক্তারী পরিভাষায় আমরা 'এণ্ডোজেনাস ডিপ্রেশান' বলে থাকি। আর বাইরের জগতের নানা কারণে যে অবসাদ আসে — যেমন, স্বজন হারানোর শোক, বিরহ-বেদনাজনিত শূণ্যতা বা বর্হিজগতের মানসিক অভিঘাত ইত্যাদিকে আমরা বলি 'এক্সোজেনাস বা রিএ্যকটিভ ডিপ্রেশান'। 'নিউরোটিক ডিপ্রেশান'-এ আবার অবসাদের সঙ্গে উৎকণ্ঠা আর মানসিক দুশ্চিন্তা প্রবলভাবে বিদ্যমান থাকে। ক্ষেত্রবিশেষে আবার দেখা যায়, অনেক রোগী বিষন্নতায় আচ্ছন্ন ও চূড়ান্ত অবসাদগ্রস্থ। কিন্তু সঙ্গে থাকে অদ্ভুত উত্তেজনাপ্রবণ মানসিক অস্থিরতা যার পরিণতিতে রোগী রাতে শান্তিতে ঘুমাতে পারে না — যাকে আমরা 'এজিটেটেড মেলানকোলিয়া' আখ্যা দিয়ে থাকি। নিজের চিকিৎসক জীবনে এ যাবৎ অনেক ডিপ্রেশানের রোগী দেখেছি, যাঁরা অবসাদ লুকিয়ে বাইরে হাসিমুখে থাকেন, রাস্তায় দেখা হলে জিজ্ঞেস করলে বলেন — তিনি সুখে ও আনন্দে আছেন। আত্মহত্যা জাতীয় হঠাৎ মারাত্মক কোনো অঘটন না ঘটালে বোঝাই যেত না যে তিনি আসলে কতটা ডিপ্রেসড ছিলেন। এই ধরণের রোগীদের সাইকিয়াট্রিস্টরা বলে থাকেন 'মাস্কড বা স্মাইলিং ডিপ্রেশান'-এর রোগী। অবসাদের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গেলে রোগী 'স্টুপরাস মেলানকোলিয়া'-য় আক্রান্ত হয়ে পড়ে। এই ধরণের বিষন্নতায় রোগীরা চিন্তা করার ক্ষমতা হারিয়ে ফ্যালে, প্রশ্ন করলে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে, সবসময় জড়ভরতের মত নির্বাক হয়ে বসে থাকে। সবশেষে, 'বাইপোলার ডিপ্রেশান'-এর রোগীদের জীবনে উত্তেজনামূলক

বাতুলতা আর বিষন্নতামূলক বাতুলতা পর্যায়ক্রমে আসে। রোগী কিছুদিন খুবই উৎফুল্ল ও আনন্দদায়ক পরিস্থিতির মধ্যে থাকে। আবার হঠাৎ করে কিছুদিনের জন্যে অবসাদের কালো মেঘ ছেয়ে যায় রোগীর মনের আকাশে।

ছাত্র-ছাত্রীদের বয়ঃসন্ধিকালীন অবসাদ কিভাবে চিনবো?

বয়ঃসন্ধিকালীন অবসাদের প্রভাবে পাড়ায় বা স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীরা অস্বাভাবিক আচরণ করে ফ্যালে। স্কুলের বন্ধু-বান্ধব বা পাড়ার পরিচিতদের থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেয়। বাড়ীতে হঠাৎ হঠাৎ রেগে চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করে, পড়াশুনায় মনোযোগের অভাব দেখা দেয়। কেউ কেউ আবার হঠাৎ হঠাৎ কান্না ও যে কোনো প্রত্যাখানেই খুবই মুষড়ে পড়ে। আমাদের মনে রাখতে হবে, মানসিক অবসাদ ছাত্র-ছাত্রীদের নেশা ও মাদকাশক্তির দিকে ঠেলে দেয়।

নারীদের মানসিক অবসাদের কারণ কি?

পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় অনেক অত্যাচার নারীরা মুখ বুজে সহ্য করে করে কালক্রমে ডিপ্রেশানে ভুগতে থাকে। স্ত্রী-পুরুষ লিঙ্গ ভারসাম্যের ঘাটতির জন্যে নানান সামাজিক বৈষম্যের শিকার হয়ে মেয়েদের অবসাদের কবলে পড়তে হয়। সংসার ও চাকরী — এই দুই মিলে বাড়তি চাপ নারীদের বিষন্নতা রোগের শিকারে পরিণত করে। নারীরা তুলনামূলকভাবে আবেগপ্রবণ বলে, কেউ কেউ আবেগের ভারসাম্য রাখতে না পেরে অবসাদে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। এছাড়া, মেয়েদের প্রথম রজঃদর্শনের (মেনার্কি) সময় থেকে মেনোপজের সময় পর্যন্ত স্ত্রী হরমোনের প্রভাবে বিভিন্ন রকমের ডিপ্রেশান আসে। জীবনে প্রথম ঋতুস্রাব শুরু হবার অব্যবহিত আগে কিশোরীদের 'প্রি-মেন্সট্রুয়াল ডিসফোরিয়া' দেখা দেয়। সন্তান জন্মদানের সময় নারীদের 'পিউরপেরাল ডিপ্রেশান' দেখা দেয়। মধ্যবয়সে মেনোপজের সময় 'ক্লাইম্যাকটেরিক সিনড্রোম'-এ অবসাদের প্রকোপ দেখা যায়।

কি কি কারণে বৃদ্ধ বয়সে মানসিক অবসাদ আসে?

নিঃসঙ্গতা বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের অবসাদের অন্যতম কারণ। শারীরিক নানা রোগের প্রকোপে বৃদ্ধাবস্থায় ডিপ্রেশান দেখা দেয়। পারিবারিক বা অর্থনৈতিক নিরাপত্তার অভাববোধ থেকে বৃদ্ধবয়সে অনেকেই ডিপ্রেশানের কবলে পড়েন। এছাড়া, ছেলে-বউয়ের সংসারে স্বাধীনতাহীনভাবে বেঁচে থাকার যন্ত্রণায় বেশী বয়সে অবসাদ ডেকে আনে।

আর কি কি কারণে মানসিক অবসাদ আসতে পারে?

১. অনেক আগের যুগে অবসাদের কারণ হিসাবে 'মেলানকোলি থিওরি' চালু ছিল। আমাদের পিত্তথলিতে কালো রঙের পিত্ত জমা হলে, তা অবসাদের অন্যতম কারণ হিসাবে পরিগণিত হোত। যাই হোক, এই তত্ত্ব আজকের দিনে অচল।

২. মস্তিষ্কের রাসায়নিক সেরোটোনিন-এর কথা আমরা জানি। সেই সেরোটোনিন ট্রান্সপোর্টার জিন-এর অস্বাভাবিকতার জন্যে বায়োজেনিক ডিপ্রেশান দেখা দেয়।

৩. আমাদের হায়ার কগনিটিভ ফাংশানকে নিয়ন্ত্রণ করে ও ব্যক্তির আবেগজীবনকে পরিচালিত করে হাইপোথ্যালামাস ও প্যাপেজ সারকিট। এদের স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপ ব্যাহত হলে মানুষ অবসাদে আক্রান্ত হতে পারে।

৪. যারা জন্মগতভাবে কুঁড়ে, অলস, কর্মবিমুখ, উৎসাহরহিত, বিষন্নতাপ্রবণ ও নিরাশাবাদী, তারা পরবর্তী জীবনে অবসাদের শিকার হয়ে পড়েন। বংশধারায় নিকট আত্মীয়ের এই রোগ থাকলে পরবর্তী প্রজন্মে তা সঞ্চারিত হতে পারে। মনে রাখতে হবে, মোটা ও বেঁটে ধরণের ব্যক্তিদের মধ্যে অবসাদের প্রকোপ বেশী দেখা যায়।

৫. ব্রেণের নিউরোট্রান্সমিটার-এর অসংগতি মানসিক অবসাদের কারণ হতে পারে। মস্তিষ্কে মনোঅ্যামাইন অক্সিডেজ-র ক্ষরণ কম হলে মানুষ বিষন্নতায় আচ্ছন্ন হতে পারে। এছাড়া, হরমোনের সমস্যাও অবসাদ ডেকে আনে।

৬. বেশ কিছু এ্যালোপ্যাথিক ঔষধের প্রভাবে মানসিক অবসাদ আসে বলে প্রমাণিত। হোমিওপ্যাথিতে উচ্চ রক্তচাপ কমানোর কার্যকরী ঔষধ সর্পগন্ধা (রাউলফিয়া সার্পেনটিনা) অতিরিক্ত ব্যবহারে সাময়িক বিষন্নতা দেখা দিতে পারে।

৭. ব্যক্তিত্বের ব্যাত্যয়-জনিত কারণে রোগী যখন তার সহজাত জৈবিক চাহিদাগুলোকে পূর্ণ করতে ব্যর্থ হয় তখন ক্রমশঃ তার মধ্যে দেখা দেয় হতাশা, অপরাধ-বোধ, বিষন্নতা, উৎসাহহীনতা, কর্মবিমুখতা ও আত্মহননের ইচ্ছা।

৮. আবেশিক বায়ুগ্রস্থ (ও.সি.ডি.) ব্যক্তিত্বের লোকজন আবেগের বিকৃতির পরিণতিতে অবসাদে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন।

৯. দীর্ঘদিন বেদনাদায়ক কঠিন অসুখে ভুগলে মানসিক অবসাদ আসে। ক্যানসার, হার্ট-অ্যাটাক, পারকিনসনস্ বা সেরিব্রো-ভাসকুলার অ্যক্সিডেণ্টের পরে অবসাদের প্রকোপ বাড়ে।

১০. ব্যক্তির কামনা-বাসনার (লিবিডো) সাথে তার প্রকৃত সামর্থের সামঞ্জস্য না থাকলে মানসিক অবসাদ দেখা দেয়।

১১. সামাজিক নানা রকম কারণে মানসিক অবসাদ গ্রাস করে। যেমন, দারিদ্র, বেকারত্ব ও ঋণগ্রস্থ অবস্থা, সাম্প্রতিক সমস্যায় জর্জরিত হয়ে ক্রমাগত মানসিক চাপ, বৈবাহিক জীবনে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অশান্তি ও দাম্পত্য-কলহ, ইত্যাদি। এছাড়াও, মদ্যপান ইত্যাদি নেশার সামগ্রী অত্যধিক সেবনে অবসাদ আসতে পারে। মাদকাসক্তদের মধ্যে তাই মানসিক অবসাদের কারণে আত্মহত্যার প্রবণতাও বেশী।

১২. আমরা এখন এক চূড়ান্ত সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের যুগে বাস করছি। এর ফলশ্রুতিতে বয়ঃসন্ধিকালের একটি ছেলে বা মেয়ে তার চারপাশের পরিবেশ থেকে বিকৃতির দীক্ষা পেয়ে যাচ্ছে। তার অবচেতন মনে গৃহীত সেইসব বিকৃতির প্রভাবে ক্রমশঃ সে উদ্বেগ ও উত্তেজনায়

ছটফট করতে থাকে। মানসিক এই স্বাস্থ্যহানির কারণে কেউ কেউ বাস্তব থেকে পালিয়ে কল্পনার জগতে বাস করতে করতে স্কিজোফ্রেনিয়া-য় আক্রান্ত হয়ে পড়ে। কেউবা আবার অপরাধ-প্রবণ হয়ে অবশেষে অসামাজিক ব্যক্তিত্ব বিকারের শিকার হয়ে পড়ে। অনেকে আবার না-পাওয়ার হতাশা থেকে অবসাদে আত্মহত্যার পথ বাছে।

মানসিক অবসাদের চিকিৎসা কিভাবে করা হয়?

এ্যালোপ্যাথি মতে, মনোরোগ চিকিৎসায় ব্যবহৃত অ্যাণ্টি-সাইকোটিক মেডিসিন ও ট্রাই-সাইক্লিক অ্যাণ্টি-ডিপ্রেকশ্যন্ট অথবা দরকার হলে টেট্রা-সাইক্লিক অ্যাণ্টি-ডিপ্রেশ্যন্ট জাতীয় ঔষধ ব্যবহার করা হয়। হোমিওপ্যাথিতেও মেণ্টাল ডিপ্রেশানের কার্যকরী চিকিৎসা আছে। এছাড়া, বৈদ্যুতিক শক্ থেরাপি (ই.সি.টি.) বিষন্ন ও অবসাদগ্রস্থ রোগীদের প্রভূত উন্নতি ঘটায়। মানসিক অবসাদে যে সমস্ত রোগী খাদ্যগ্রহণ বন্ধ করে দেয় বা আত্মহত্যার চেষ্টা করে — তাদের জন্যে বৈদ্যুতিক শক্ থেরাপি যারপরণাই উপকারী।

সাইকোলজিক্যাল কাউন্সেলিং বা সাইকোথেরাপির টেকনিক-গুলো কি অবসাদের চিকিৎসায় কাজে আসে?

ঔষধের পাশাপাশি কাউন্সেলিং পদ্ধতিগুলো খুবই ভালো ফল দেয়। আমরা সাধারণভাবে ডাইরেক্টিভ, নন্-ডাইরেক্টিভ এবং একলেকটিক পদ্ধতিতে কাউন্সেলিং করে থাকি। এই তিন রকম ক্ষেত্রেই, ব্যক্তির কামনা-বাসনা আর চাওয়া-পাওয়ার সাথে তাঁর প্রকৃত সামর্থের কাউন্সেলিং-এর মাধ্যমে সামঞ্জস্য-বিধান করতে হবে। সাইকোথেরাপি বা মনঃচিকিৎসার ক্ষেত্রে কগনিটিভ বিহেভিয়ার থেরাপি, সাপোর্টিভ ও এক্সপ্রেসিভ সাইকোথেরাপির পাশাপাশি ক্রাইসিস ইণ্টারভেনশান ও বিহেভিয়ার মডিফিকেশন-এর পদ্ধতিগুলো অনুসরণ করে অবসাদের চিকিৎসা করতে হবে।

ঔষধ ও কাউন্সেলিং ছাড়া মানসিক অবসাদ থেকে মুক্তির আর কিছু উপায় কি আছে? এ রোগের প্রতিকারে আমরা আর কি কি করতে পারি?

আজকের দিনে জটিল আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে মেণ্টাল ডিপ্রেশান আমাদের জীবনের ভারসাম্য নষ্ট করে দিচ্ছে। ফলে, এই মানসিক অবসাদ যদি আপনার জীবন সংশয়ের কারণ হয়ে ওঠে, তবে তৎক্ষণাৎ আপনি সাইকোথেরাপিস্ট বা ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট অথবা সাইকিয়াট্রিস্ট-এর পরামর্শ অবশ্যই নিন। কিন্তু কথায় কথায় মুড়ি-মুড়কির মত নিজে নিজে অ্যাণ্টি-ডিপ্রেসিভ ড্রাগ খেয়ে সমস্যাকে অযথা জটিল করে তুলবেন না।

রোগের প্রাথমিক পর্যায়ে অবসাদ থেকে মুক্তির উপায় হিসাবে নিম্নলিখিত সহজবোধ্য পদ্ধতিগুলো অনুসরণ করে দেখুন —

১. অবসাদ কাটাতে কোনো কথাই নিজের মনে গোপন রাখবেন না। আপনার সমস্যার ব্যাপারে সমমর্মী কোনো ব্যক্তিকে আপনার মানসিক অবস্থার অংশীদার করে নিন।

সেল্ফ-কাউন্সেলিং করে নিজের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করুন। পারিবারিক ও সামাজিকভাবে নিজের কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হোন। তবে মানসিক অবসাদগ্রস্থ অবস্থায় কোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেবেন না। নেগেটিভ লোকজনদের থেকে সর্বদা দূরে থাকুন।

২. বিশেষ ধরণের ব্যায়ামের সাহায্যে অবসাদের মাত্রা কমিয়ে আনা যায়। বাড়ির থেকে দূরে কোনো অচেনা রাস্তায় বেশ খানিকটা হেঁটে আসুন। পুকুরে সাঁতার কাটুন বা যোগ ব্যায়াম অভ্যাস করুন। দিনের বেশ খানিকটা সময় শিশুদের সাথে খেলাধূলা করে কাটান। এজন্যে প্রথমে ঘর থেকে বেরিয়ে কিছুক্ষণ আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকুন। ডিপ্রেশান কমাতে অবসর সময়ে ভালো বন্ধুদের ফোন করার অভ্যাস করুন। যে সমস্যার সমাধান অসম্ভব ভেবে আপনি অবসাদগ্রস্থ — তা কোনো অন্তরঙ্গ বন্ধুকে খুলে বলুন। জীবনে যা যা পাননি তার জন্যে দুঃখপ্রকাশ বা অভিযোগ-অনুযোগ না করে — যা যা পেয়েছেন তার জন্যে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিন।

৩. আপনার মেন্টাল ডিপ্রেশান সংক্রান্ত সমস্যার ব্যাপারে মনোচিকিৎসক বা সাইকোথেরাপিস্ট-এর পরামর্শ অবশ্যই নিন। কিন্তু আপনি নিজের উদ্যোগে পত্র-পত্রিকা, বইপত্র পড়ে অবসাদ কাটানো প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলী জানার চেষ্টা করুন। এইভাবে অর্জিত আত্মবিশ্বাস আপনাকে অবসাদগ্রস্থ অবস্থা থেকে মুক্তির পথ দেখাবে। জীবনে চলার পথে সবক্ষেত্রে প্রতিদিন কিভাবে অন্যের থেকে নিজেকে এগিয়ে যাবেন, সততঃ সেই ভাবনাকে লালিত করুন। সৃজনশীল চিন্তা-প্রক্রিয়ার বিকাশের পথে আপনার ডিপ্রেশান কেটে যাবে।

৪. অবসাদগ্রস্থ মানুষকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে বাড়ির অন্যেরা সর্বদা তাঁর পাশে আছেন এবং তাঁর অবসাদের কারণ খুঁজে তার প্রতিকারের জন্যে আত্মীয় পরিজন সবাই আন্তরিক চেষ্টা করছেন। অনেকদিন একা থাকতে থাকতে মানুষ অবসাদগ্রস্থ হয়ে পড়ে। তাই চেষ্টা করুন পরিবার-পরিজনদের সান্নিধ্যে থাকতে। তাছাড়া, এমন বন্ধুদের সংস্পর্শে থাকুন — যাঁরা আপনার অবসাদগ্রস্থ অবস্থা কাটিয়ে উঠতে যথাযথ সহযোগিতা করতে পারেন। আপনার বন্ধুরা যদি পজিটিভ অ্যাটিচিউড-এর হন, তাহলে তাঁরা আপনার মনের জোর বাড়াতে সাহায্য করতে পারেন।

৫. প্রাণ খোলা হাসি টেনশান্ ও ডিপ্রেশান কাটানোর মোক্ষম দাওয়াই। সুস্থ রুচির জোকস্-এর বই পড়তে পারেন। টেলিভিশানে আজকাল অনেক মজার অনুষ্ঠান হয়। সময় ও সুযোগ করে সেগুলো দেখতে পারেন। বর্তমানে পাড়ায় পাড়ায় লাফিং ক্লাব চালু হয়েছে — সেখানে সম্ভব হলে যোগ দিতে পারেন। মাঝে মধ্যে আপনার প্রিয় গান বা লঘু শাস্ত্রীয় সংগীত শুনুন। আজকাল বিদেশে মিউজিক থেরাপি চালু হয়েছে ডিপ্রেশান কাটিয়ে ওঠার জন্য। সেজন্যে এমন গান শুনুন যা আপনার মানসিক শান্তি পুনরুদ্ধারে কার্যকরী ভূমিকা নেবে।

৬. মানসিক অবসাদ কাটাতে নানাবিধ ধর্মীয় পুস্তক আপনাকে সাহায্য করতে পারে। আপনার মেন্টাল ডিপ্রেশানের জন্যে কোনো শারীরিক সমস্যা দায়ী কিনা জানার চেষ্টা করুন। দিনে অন্ততঃ

সাত-আট ঘণ্টা ঘুমান, হাল্কা ব্যায়াম করুন এবং সম্ভব হলে কিছুটা সময় ধ্যান অনুশীলন করুন। মনের ভারসাম্য বজায় রাখতে মেডিটেশান-এর জুড়ি নেই। দিনের কাজ দিনের দিন করতে শিখুন। প্রাত্যহিক কাজকর্ম নিয়মিত সেরে রাখার অভ্যাস থাকলে অযথা টেনশন হয় না। টাইম ম্যানেজমেণ্ট-এর আদব কায়দা জানলে অনেক টেনশন থেকে মুক্ত থাকা যায়।

৭. জীবনের সাফল্য ও ব্যর্থতা দুটোই সহজভাবে গ্রহণ করার চেষ্টা করুন। নিজেকে বাস্তববাদী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করুন। অযৌক্তিক চিন্তা ও অবাস্তব ভাবনা মনে লালন করবেন না। তাতে না পাওয়ার যন্ত্রণা আপনাকে অবসাদগ্রস্থ করে তুলতে পারে। ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নিয়ে নিজেকে সফলকাম করে তুলুন। আপনার জীবনের প্রাত্যহিক ঘটনাক্রম ব্যক্তিগত ডায়েরী-তে লিখুন। এতে আপনার সমস্ত অনুভূতির বাহ্যিক প্রকাশ হবে — যা আপনার মানসিক অবসাদ কাটাতে যারপরনাই সাহায্য করবে। যাতে আপনি মানসিক শান্তি পাবেন এমন সামাজিক কিংবা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করুন। অনেক সময় একাকীত্ব থেকে অবসাদের জন্ম হয়। সেজন্যে একা না থেকে নানা ধরণের লোকজনের সাথে মিশে থাকার চেষ্টা করুন। একাকীত্ব থেকে মুক্তি পেলে আপনার মানসিক অবসাদের উপশম হবে।

৮. অবসাদ যখন মানুষকে গ্রাস করে, তখন মানুষ আলস্যপ্রবণ হয়ে ওঠে। সেই আলস্য কাটিয়ে উঠতে বাড়ির কিছু কাজ নিজে হাতে করুন। ঘর-বাড়ি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখুন এবং সুন্দর করে সাজান। বাড়ি সংলগ্ন বাগান পরিচর্যা করুন। কিচেন গার্ডেন-এ শাক-সব্জী ফল-মূল চাষ করুন। ভালো কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখতে পারলে, নিজেকে অবসাদ থেকে দূরে রাখতে পারবেন। হঠাৎ কোনো বড় কাজে হাত দেবার আগে ছোট ছোট কাজ সফলভাবে সম্পাদন করার দিকে মনোযোগ দিন। গঠনমূলক কাজের জন্যে মানসিক প্রস্তুতি নিলে আপনি নিজেকে ডিপ্রেশান থেকে দূরে রাখতে পারবেন। নানাবিধ এন.জি.ও আমাদের সমাজে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভালো ভালো কাজ করে। আপনিও কিছুটা সময় ভালো এন.জি.ও-র মাধ্যমে সেবামূলক কাজে নিয়োজিত হতে পারেন। এরপরেও যদি আপনি গভীরভাবে অবসাদগ্রস্থ হন, তাহলে কোনো কথাই নিজের মনে গোপন না করে সাইকোলজিক্যাল কাউন্সেলর বা সাইকোথেরাপিস্ট-এর কাছে গিয়ে খুলে বলুন। তিনি আপনাকে অবসাদ থেকে মুক্তির উপায় বলে দেবেন।

অত্যধিক সোস্যাল মিডিয়ায় আসক্তি মনের অসুখ বাড়াচ্ছে

সোস্যাল মিডিয়া বর্তমানে তাবৎ বিশ্ব-সমাজকে যুক্ত করে রেখেছে ঠিকই, কিন্তু এর প্রতি অত্যধিক নির্ভরতা এখন অনেকেরই মাথা-ব্যাথার কারণ হয়ে উঠেছে। সমগ্র পৃথিবীতে এখন ২১০ মিলিয়ন নারী-পুরুষ মাত্রাছাড়া প্রযুক্তি-নির্ভরতার কারণে মনোবিকারের শিকার। যে সব কিশোর-কিশোরী দিনে ৫ ঘণ্টা তাদের স্মার্টফোনে সময় কাটায়, তাদের মাঝারি মাত্রার মানসিক অবসাদের শিকার হওয়ায় প্রবল সম্ভাবনা থাকে। ডিজিট্যাল মিডিয়ায় আসক্তি বেশী দেখা যায় তরুণ-তরুণীদের মধ্যে, বিশেষতঃ যারা একা একা থাকে। ৭০% লোক মোবাইল ফোনকে সঙ্গী করে বিছানায় যায়, যার কুপ্রভাবে দফারফা হয় তাদের ঘুমের। সোস্যাল মিডিয়ায় অতিরিক্ত সময় কাটানোর আনন্দ মানবমস্তিষ্কের 'রিওয়ার্ড সেন্টার'-এ প্রচুর পরিাণে ডোপামিন ঢুকিয়ে দেয়, যার প্রভাবে মানুষ আরো বেশী করে আসক্ত হয়ে পড়ে।

'উই আর সোস্যাল' নামের একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের উপর একটি রিপোর্ট তৈরী করেছে। তাতে দেখা যাচ্ছে, সর্বাধিক ইন্টারনেট ব্যবহারকারী দেশ ফিলিপিনস্ গড়ে দৈনিক ৫.২ ঘণ্টা কম্পিউটারে আর ৩.২ ঘণ্টা স্মার্টফোনে সময় কাটায়। এই সারণীতে অন্যান্য দেশগুলো হল ক্রমান্বয়ে ব্রাজিল, মেক্সিকো, আর্জেন্টিনা, আরব আমীরশাহী, মালেশিয়া, সৌদি আরব, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া ও সাউথ আফ্রিকা।

পারস্পরিক সম্পর্ক ও মানসিক স্বাস্থ্যের উপর সোস্যাল মিডিয়ার কিছু ইতিবাচক প্রভাব আছে। সম-মনস্ক লোকজনেরা এর মাধ্যমে একাকীত্ব থেকে মুক্তি পেতে পারে। দম্পতিরা মধুর সম্পর্কে আবদ্ধ থাকতে পারে। অনেকে ফিরে পেতে পারেন তাদের হারানো বন্ধুত্ব। অ্যানড্রয়েড ফোন হেলথ্ অ্যাপ-এর মাধ্যমে আমরা স্বাস্থ্য-সচেতন হতে পারি। এসব নানা ধরনের সুবিধা থাকা সত্ত্বেও বর্তমান ডিজিটাল জগতে আমাদের কিশোর-কিশোরীরা ভয়ানক স্বাস্থ্য-সমস্যার শিকার হচ্ছে। এর কুপ্রভাবে ছেলে-মেয়েরা বাস্তব জীবনে সামাজিক দক্ষতা অর্জনে ব্যর্থ হচ্ছে। হারিয়ে ফেলছে আবেগগত ভারসাম্য। যার সুদূরপ্রসারী প্রভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনায় মনোযোগ ব্যাহত হচ্ছে। অতিরিক্ত ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের মধ্যে দেখা দিচ্ছে অ্যাংজাইটি, ডিপ্রেশন, অনিদ্রা, টেনশন, ওবেসিটি, ম্যুড স্যুইং, মানসিক ক্লান্তি, আরো কত কি! ইংল্যান্ডের 'রয়্যাল সোসাইটি ফর পাবলিক হেলথ্'- এর সমীক্ষা থেকে শিক্ষা নিয়ে আমাদের মোবাইল আসক্তির কারণে মানসিক অবসাদের ব্যাপারে সচেতন হতে হবে। তাদের

রিপোর্টে মানসিক স্বাস্থ্যের উপর ফেসবুক, ট্যুইটার, ইনস্টাগ্রাম ইত্যাদির নেতিবাচক প্রভাবের ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে।

কি কি লক্ষণ দেখে বুঝবেন আপনি সোস্যাল মিডিয়ায় আসক্ত

১. আপনি যদি দু'-দশ মিনিট অন্তর-অন্তর মোবাইল ফোনে ইনবক্স মেসেজ, হোয়াট্স-অ্যাপ মেসেজ, নোটিফিকেশন চেক্ করেন, বুঝবেন আপনি সোস্যাল মিডিয়ায় আসক্ত।

২. ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের অবসর সময়ের পুরোটাই যদি সোস্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টে ব্যয় করে, বুঝতে হবে তারা এতে অতিরিক্ত আসক্ত। হোমওয়ার্ক অ্যাসাইমেন্ট তৈরী করা ভুলে, খেলাধূলা ছেড়ে যে সব শিক্ষার্থী ফেসবুক বা ইউ-টিউবে মজে থাকে, তারা প্রবলভাবে আসক্তির শিকার।

৩. সোস্যাল মিডিয়ায় আসক্ত ব্যক্তিরা বেশীক্ষণ ইন্টারনেট সংযোগ বিচ্ছিন্ন থাকলে বা ওয়াই-ফাই সুবিধা ব্যাহত হলে, অন্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার ভয়ে টেনশন ও অবসাদের শিকার হয়ে পড়ে।

৪. যারা ৩-৪ ঘণ্টার বেশী সোস্যাল মিডিয়ায় সময় কাটায়, তারা 'ক্লিনিক্যালি অ্যাডিক্টেড'। এরা তুচ্ছ অনেক জিনিস যেমন, ঘুম থেকে ওঠার সময়, লাঞ্চ ও ডিনার টাইম, কেনাকাটার খুঁটিনাটি ইত্যাদি সোস্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করতে অভ্যস্ত।

৫. আপনি আপন মনে স্মার্টফোন ঘেঁটে চলেছেন, একই ঘরে বসে বাড়ীর অন্যেরা আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হচ্ছেন – এর অর্থ আপনার আসক্তি অনেক গভীরে। এই ধরনের লোকেরা বাস্তব জগৎ থেকে ভার্চুয়াল জগতের খবরাখবর বেশী রাখে।

৬. বাড়ী থেকে বেরুনোর সময় মোবাইল ফোন নিয়ে যেতে ভুলে গেলে যাদের 'আইসোলেশন ফোবিয়া' দেখা দেয়, তারা আসলে ডিজিটাল মিডিয়ায় প্রবলভাবে আসক্ত। এরা অল্পদিনের ছুটিতে বাড়ীর বাইরে বেড়াতে যাওয়ার সময় ল্যাপটপ নিয়ে যেতে ভুলে গেলে বুক ধড়ফড়ানির শিকার হয়ে পড়ে।

৭. সোস্যাল মিডিয়ায় প্রবল আসক্তির কারণে অনেকে আজকাল কথাবার্তার মধ্যে 'হ্যাশ ট্যাগ', 'ইনবক্স', 'ট্যুইট', 'আপডেট' ইত্যাদি শব্দবন্ধ বারংবার ব্যবহার করে। এই ধরনের লোকেরা নিজের পোষা কুকুরের নামেও ফেসবুকে বা ট্যুইটারে অ্যাকাউন্ট খুলে রাখে।

৮. আপনি যদি ঘন ঘন আপনার ফেসবুক স্ট্যাটাস আপডেট করতে থাকেন এবং সেটা যদি অবসেসন-এর পর্যায়ে চলে যায়, তাহলে বুঝবেন আপনি ডিজিটাল মিডিয়ায় আসক্ত। এই ধরনের আসক্তি-প্রবণ লোকজন টয়লেট বা ওয়াশরুমে ঢোকার সময়ও মোবাইল ফোন সঙ্গে নেয়।

৯. সোস্যাল মিডিয়ায় আসক্ত লোকজন মনে করে, তাদের যে সব বন্ধুদের হোয়াটস-অ্যাপ বা ফেসবুক অ্যাকাউন্ট নেই – তারা অসামাজিক জীব। ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট স্বীকার না করলে এইসব লোকজন স্ট্রেস্ ও টেনশনের শিকার হয়ে পড়ে। এরা অনেকে অন্যের সোস্যাল মিডিয়া অ্যাকউন্টে গোপনে নজরদারী চালায়।

১০. ব্যাঙ্কের চেক-বুকে সই করার সময় আপনি যদি আপনার ট্যুইটার হ্যান্ডেল-এর নাম লিখে বসেন, বাস্তব জগতের থেকে অনলাইনে যদি আপনার বন্ধুর সংখ্যা বেশী থাকে, মাঝরাতে উঠে উঠে যদি আপনার 'আপডেট্' ও 'কমেন্ট' চেক্ করার অভ্যাস থাকে – তাহলে আপনি অবশ্যই সোস্যাল মিডিয়ায় আসক্ত।

সোস্যাল মিডিয়ায় অত্যধিক আসক্তি কাটাবেন কিভাবে

১. সীমিত পরিমাণে ফেসবুক, ট্যুইটার, ইউ-টিউব, ইনস্টাগ্রাম ব্যবহার করুন। দিনে সর্বাধিক এক ঘণ্টা সোস্যাল মিডিয়ায় সময় কাটান।

২. আপনার দৈনন্দিন রুটিনে র পক্ষে ক্ষতিকর সোস্যাল মিডিয়া নোটিফিকেশনগুলো বন্ধ করে দিন। এতে বাস্তব জীবনের কাজকর্ম গুছিয়ে করতে আপনার অনেক অনেক সুবিধা হবে। অনলাইন ইন্টারনেট জগতে যা কিছু ঘটছে, তা ভুলে থাকার চেষ্টা করুন। গ্যাজেট নোটিফিকেশন বন্ধ না করলে আপনার মনঃসংযোগ বিক্ষিপ্ত হবেই।

৩. অবসর সময়ে মোবাইলের পর্দায় চোখ না রেখে বাস্তব-সম্মত নতুন কোনো হবি বেছে নিন। এতে আপনার ম্যুড স্যুইং ঠিক হয়ে যাবে, বৃদ্ধি পাবে আপনার কর্মদক্ষতা।

৪. ভার্চুয়্যাল জগতের ফাঁদ থেকে বেরুনোর চেষ্টা করুন। সপ্তাহান্তে দু'দিন সোস্যাল অ্যাকাউন্ট সাইন-অফ করে রাখুন। পরিবর্তে ভালো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করুন, সম্মিলিতভাবে গঠনমূলক কাজে মনোনিবেশ করুন। স্মার্টফোন আর কম্পিউটার স্ক্রীনের পিছনে বাস্তব জীবনের যে সব বর্ণ-গন্ধ তাদের রসাস্বাদন করুন।

৫. জীবনের সবকিছুই সেলফির মাধ্যমে ধরার চেষ্টা করবেন না। নিজের ভালো কাজের মাধ্যমে বরং আত্মীয়-বন্ধুদের মনের মণিকোঠায় স্থান পাবার চেষ্টা করুন।

৬. সোস্যাল মিডিয়ায় অস্বাস্থ্যকর প্রভাব থেকে মুক্তি পেতে ছাত্র-ছাত্রীদের উচিৎ ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, ট্যুইটার প্রভৃতি সোস্যাল মিডিয়া প্রোফাইল মুছে ফেলা। শিক্ষার্থীর বরং অবসর সময়ে মোটিভেশনাল বুক বা মহাপুরুষদের জীবনীগ্রন্থ পড়ুক।

অভিভাবকদের জন্যে বিশেষ পরামর্শ

টিভি-র সামনে বসিয়ে বা মোবাইলে ভিডিও চালিয়ে বাচ্চাকে খাবার খাওয়াবেন না। বাচ্চার কান্না থামানোর জন্যে তার হাতে মোবাইল ফোন তুলে দেবেন না। অবসর সময়ে টিভি-র কার্টুন নেটওয়ার্ক, বা অ্যানিমেশনের অ্যাকশন থ্রিলার যেন ছোটদের একমাত্র সঙ্গী হয়ে না ওঠে। বেশীক্ষণ স্মার্টফোনে ভিডিও গেম খেললে ছোটদের মস্তিষ্কে প্রভূত ক্ষতি হয়। বাচ্চার মধ্যে দেখা দেয় অতিরিক্ত রাগ, বদমেজাজ, অতি-চঞ্চলতা ও অন্যান্য নানান আচরণগত আগ্রাসন। এসব থেকে রক্ষা পেতে সন্তানের সাথে বন্ধুর মতো মেলামেশা করুন। গৃহবন্দী করে না রেখে সুস্থ সাংস্কৃতিক পরিবেশে মেলামেশার সুযোগ করে দিন। তাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে সবুজ মাঠে খেলাধূলার সুযোগ করে দিন। ইন্টারনেটে অ্যাডাল্ট ভিডিও থেকে কৈশোরে অনেকেই শিকার হয় যৌন অপরাধের। 'ব্লু-হোয়েল' বা 'মোমো' জাতীয় স্যুইসাইড গেম ছোটদের আত্মহত্যায় প্রলুব্ধ করে। এতে পড়াশোনা আর মানসিক ভারসাম্যর যে দফারফা হয়, তা আজ আর কারো অজানা নয়। বিচক্ষণ অভিভাবকগণ তাই সন্তানের হাতে কিছুতেই অ্যান্ড্রয়েড ফোন তুলে দিতে চান না। বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে, খুব ছোটবেলা থেকে বাচ্চাদের হাতে মোবাইল দিলে তাদের কথা বলা শিখতে দেরী হয়, চোখের দৃষ্টিশক্তি ব্যাহত হয়, মনোযোগের সমস্যা দেখা দেয়, দেখা দেয় ঘুমের সমস্যা। এছাড়া মোবাইল রেডিয়েশন থেকে বিবিধ শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য-সচেতনতার কথা মাথায় রেখে সর্বদা ছোটদের স্মার্টফোন থেকে দূরে রাখুন।

শিশুদের বর্ধিত মানসিক চাপ কাটাবেন কীভাবে

বর্তমান অবক্ষয়িত মূল্যবোধের যুগে বড়দের পাশাপাশি শিশুদেরও নানান ধরনের মানসিক চাপ নিয়ে বাঁচতে হয়। পিতা-মাতার অপূর্ণ স্বপ্ন পূরণের মাধ্যম হিসাবে শিশুরা আজ বলির পাঁঠা। লক্ষ্যে পৌঁছনোর ইঁদুর দৌড়ে শামিল করে আমরা বড়োরা জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে সরলমতি শিশুদের শৈশবকে দুমড়ে-মুচড়ে দিচ্ছি – কিশলয় মন হয়ে পড়ছে মানসিক অবসাদের শিকার।

শিশুদের কেন এত মানসিক চাপ

১. অ্যাকাডেমিক প্রেশার – নিচু ক্লাশের শিশুরা মাত্রাতিরিক্ত ভারী সিলেবাস, হোম-টাস্ক, প্রোজেক্ট ইত্যাদির চাপে ভীত-সন্ত্রস্ত। স্কুল ছাড়াও সকাল-বিকালে তিন-চার জায়গায় পড়তে যাওয়া – সব মিলিয়ে তার খেলাধূলার সময়টুকু চুরি করে নেয়।

২. এক্সট্রা-কারিক্যুলার অ্যাক্টিভিটি – পড়াশুনা ছাড়াও ছোট শিশুদের আমরা নিয়ে যাচ্ছি নাচের বা গানের ক্লাশে কিংবা ক্যারাটে শেখাতে। এত কাজের চাপ শিশুমন নিতে পারে না।

৩. স্কুল প্রেশার – কাঙ্খিত রেজাল্ট না করতে পারলে, বাবা-মায়ের কাছে বকুনি। লেখাপড়ায় উল্লেখযোগ্য সাফল্য না পেয়ে, স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেবার ভয়ে বয়ঃসন্ধির বালক-বালিকাদের তাড়িয়ে বেড়ায়।

৪. ইলেকট্রনিক গ্যাজেট – মোবাইল, কম্পিউটার, ইন্টারনেট ইত্যাদির এই সহজলভ্য যুগে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা লুকিয়ে-চুরিয়ে নানান বিকৃত অ্যাডাল্ট কনটেন্ট দেখতে দেখতে মানসিক বিপর্যয়ের মুখে পড়ছে।

৫. পেরেন্টাল স্ট্রেস – পিতা-মাতার মধ্যেকার ঝগড়াঝাঁটি, মনোমালিন্য শিশুমনে কুপ্রভাব ফ্যালে। বাবা-মায়ের মধ্যে যদি ডিভোর্স হয়ে যায়, তাতে সন্তানের উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা বাড়তে থাকে। দারিদ্র, অর্থনৈতিক সমস্যাও মানসিক চাপ বৃদ্ধির অন্যতম কারণ হতে পারে।

৬. ক্রনিক ইলনেস – বাচ্চার যদি অ্যাজমা, ওবেসিটি, এ.ডি.এইচ.ডি ইত্যাদি থাকে তাহলে সে মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়া করতে পারবে না – ফলতঃ মানসিক চাপে ভুগতে থাকে।

৭. একাকীত্ব – নিউক্লিয়ার ফ্যামিলিতে আজকাল একটিমাত্র সন্তান। বাবা-মা ব্যস্ত কর্মক্ষেত্রে। সন্তানকে সময় দেবার কেউ নেই। ফলে সে হয়ে পড়ছে নিঃসঙ্গ একাকীত্বের শিকার। সেই মানসিক চাপ নিতে না পেরে বাচ্চারা হয়ে পড়ছে অসহিষ্ণু, উদ্ধত, খিটখিটে মেজাজের।

৮. স্কুল ফোবিয়া – স্কুলের পড়াশোনা ঠিকমত না পারলে, বাৎসরিক পরীক্ষায় ফেল করার আশঙ্কা হলে, স্কুলে শিক্ষক বা সহপাঠীদের কাছে অপমানিত লাঞ্ছিত হওয়ার ভীতি থেকে শিশুরা স্কুলে যেতে চায় না। তাকে নিয়ে স্কুলে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটলে, তার পরদিন থেকে বাচ্চারা স্কুলে যেতে চায় না। এইসব মানসিক চাপ থেকে শিশুরা ডিপ্রেসিভ মুড সিনড্রোম-এ আক্রান্ত হয়।

৯. শরীরচর্চার অভাব – নানা কারণে শিশুদের শচীরচর্চার সময় হয়ে ওঠে না। অনেক বাবা-মায়েরা এ ব্যাপারে তাদের যথাযথভাবে উৎসাহিত করেন না। ফাস্ট-ফুড, জাঙ্ক-ফুড খেয়ে বাচ্চারা মোটা হয়ে যাচ্ছে- যার ফলশ্রুতিতে তাদের দেহে-মনে দেখা দিচ্ছে নানাবিধ বিকার।

১০. সাংস্কৃতিক কারণ – আমরা এখন এক চূড়ান্ত সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের যুগে বাস করছি। এর ফলে বয়ঃসন্ধিকালের একটি ছেলে বা মেয়ে তার চারপাশের পরিবেশ থেকে বিকৃতির দীক্ষা পেয়ে যাচ্ছে। তার অবচেতন মনে গৃহীত সেইসব বিকৃতির প্রভাবে ক্রমশঃ সে উদ্বেগ ও উত্তেজনায় ছটফট করতে থাকে। মানসিক এই স্বাস্থ্যহানির কারণে কেউ কেউ বাস্তব থেকে পালিয়ে কল্পনার জগতে বাস করতে করতে স্কিজোফ্রেনিয়া-য় আক্রান্ত হয়ে পড়ে। কেউ বা আবার অপরাধপ্রবণ হয়ে অবশেষে অ্যান্টিসোস্যাল পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডার-এর শিকার হয়ে পড়ে। অনেকে আবার না-পাওয়ার হতাশা থেকে অবসাদে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়।

মানসিক চাপে শিশুরা কেমন আচরণ করে

মানসিক চাপ সামলাতে না পেরে শিশুরা পাড়ায় বা স্কুলে বিবিধ অস্বাভাবিক আচরণ করে ফ্যালে। স্কুলের বন্ধুবান্ধব বা পাড়ার পরিচিতদের থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেয়। বাড়ীতে হঠাৎ হঠাৎ রেগে চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করে, পড়াশোনায় মনোযোগের অভাব দেখা যায়। কেউ কেউ আবার হঠাৎ হঠাৎ কান্না ও যে কোনও প্রত্যাখানেই খুবই মুষড়ে পড়ে। মানসিক চাপের কুপ্রভাবে শিশুরা উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় ডুবে যায়। ঘুমের সমস্যার পাশাপাশি স্টোম্যাক পেইন, বমিভাব, মাথায় যন্ত্রণা ইত্যাদিও হতে পারে।

মানসিক চাপ থেকে শিশুদের স্বাস্থ্য-সমস্যা

১. টেম্পারামেন্ট ডিসঅর্ডার – অতিরিক্ত মানসিক চাপ থেকে শিশুদের বদমেজাজের মত মনোবিকার দেখা দেয়। বাচ্চারা প্রচণ্ড রাগী হয়ে ওঠে। যা বায়না করে তখনই তা না পেলে হাতের সামনে যা জিনিসপত্র পায়, তা ভাঙতে শুরু করে। নিজের মাথার চুল ছিঁড়তে শুরু করে, অনেকে আবার বাবা-মায়ের গায়ে হাতও তোলে। বিহেভিয়ার মডিফিকেশন থেরাপির সাহায্যে বাচ্চাদের এই ধরনের অস্বাভাবিক আচার-আচরণগুলো অনেকাংশে প্রশমিত করা যায়।

২. স্কিজো-অ্যাফেক্টিভ ডিসঅর্ডার – এতে শিশুরা লেখাপড়ায় অমনোযোগী হয়ে পড়ে, খেলাধূলায় তার আর মন বসে না। নিজেকে গুটিয়ে নেয়, অল্পেই বিরক্ত হয়ে পড়ে। তার কাজকর্ম ও আবেগ প্রকাশের মধ্যে কোনো সামঞ্জস্য থাকে না। পজেটিভ রি-ইনফোর্সমেন্ট থেরাপির সাহায্যে এ সমস্যার সমাধান করা যায়।

৩. অ্যাটেনশান ডিফিসিট হাইপার-কাইনেটিক সিনড্রোম – মাত্রাছাড়া মানসিক চাপ সামলাতে না পেরে বাচ্চারা অতি-চঞ্চলতা ও মনঃসংযোগের সমস্যায় ভোগে। এতে শিশুদের শিখন-প্রক্রিয়া বাধাপ্রাপ্ত হয়। এরা পিতা-মাতা ও স্কুলে শিক্ষক মহাশয়দের অবাধ্য হয়। বিহেভিয়ার ইন্টারভেনশান পদ্ধতিতে এ সমস্যার সমাধান করা যায়।

৪. অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডার – মানসিক চাপে বিপর্যস্ত শিশুরা অমূলক ভয়ের শিকার হয়ে পড়ে। এই সমস্যা থেকে মাথাব্যথা, পড়াশোনার আগ্রহের অভাব ও মনোযোগের সমস্যা হতে পারে। ইন্ডিভিজুয়াল সাইকোথেরাপীর সাহায্যে এ সমস্যা প্রতিকার করা যায়।

৫. ইটিং ডিসঅর্ডার – মানসিক চাপে ভারাক্রান্ত শিশু অ্যানোরেক্সিয়া নার্ভোসা-য় আক্রান্ত হয়। এদের ক্ষুধামান্দ্য ও খাবারে রুচির অভাব দেখা দেয়। ইন্সট্রুমেন্টাল কন্ডিশনিং পদ্ধতিতে এর সমাধান করা যায়।

৬. স্লিপ টেরর ডিসঅর্ডার – বিবিধ চাপের ধকল সইতে না পেরে শিশুরা নিদ্রাহীনতার শিকার হয়। ঘুম সংক্রান্ত এই ধরনের বিশৃঙ্খলায় ছেলে-মেয়েরা মাঝপথে ঘুম ভেঙে উঠে চিৎকার করে কেঁদে ওঠে ও খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

৭. ডিপ্রেসিভ সাইকোসিস – মানসিক চাপে বিপন্ন শিশুদের ডিপ্রেশনের অ্যাকিউট অ্যাটাক হতে পারে। তখন অযথা রাগ, অপরাধপ্রবণতা, লেখাপড়ায় অমনোযোগ, খাবার-দাবারে অনিচ্ছা ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়। সাইকোথেরাপী ও অ্যান্টি-ডিপ্রেসিভ ড্রাগ-এর সাহায্যে এর চিকিৎসা করা হয়।

সন্তানের মানসিক চাপ প্রশমনে পিতা-মাতার করণীয়

গুড পেরন্টিং-এ অবশ্যই মনে রাখতে হবে, আপনিই আপনার শিশু-সন্তানের প্রথম রোল মডেল। পিতা-মাতার সততা, সদ্ব্যবহার ও অন্যান্য ভালো গুণ কালক্রমে শিশুমনে সঞ্চারিত হয়। সেজন্য তার সাথে ব্যবহার করার সময় কখনোই মিথ্যাচারিতার আশ্রয় নেবেন না। আপনাদের অপূর্ণ ইচ্ছাগুলো পূরণ করার জন্য শিশুদের উপর অযথা প্রত্যাশার চাপ তৈরী করবেন না। এমনিতেই পড়ার চাপ, স্কুলের বন্ধুদের মধ্যেকার রেষারেষি, কেরিয়ারের ইঁদুর দৌড় ইত্যাদির চাপে সরল অনভিজ্ঞ শিশুমন বিপর্যস্ত।

সন্তানের বর্ধিত মানসিক চাপ প্রশমনে নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলো অনুসরণ করতে পারেন –

১. ঐকান্তিক স্নেহ-ভালোবাসা দিয়ে শিশুকে মানুষ করুন। তার ছোট ছোট ভালো কাজের প্রশংসা করুন। আপনার সন্তান যেন পরিবার ও নিকট আত্মীয়-স্বজনদের সবার হৃদয়ে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে থাকে।

২. ছেলেবেলা থেকে সন্তানকে শৃঙ্খলাপরাণতার শিক্ষা দিন। শৈশব থেকেই তার মানসিক মূল্যবোধের বিকাশে নজর রাখুন।

৩. শিশু-সন্তানকে সময়ে-অসময়ে অতিরিক্ত শাসন করা উচিত নয়। আপনি তার সঙ্গে যে ব্যবহার করবেন বা তাকে যা-যা করতে আদেশ দেবেন – তার মধ্যে যেন সঙ্গতি থাকে। অতিরিক্ত সমালোচনা, অন্যায় শাসন, তিরস্কার বা নিষ্ঠুর আচরণ শিশুমনকে অবাধ্য ও প্রতিহিংসাপরায়ণ করে তুলতে পারে।

৪. কখনোই শিশুকে বলবেন না, তোমার দ্বারা এটা হবে না বা তুমি ওটা করতে পারবে না। তার নিজের ভুল থেকে তাকে শিখতে দিন, আপনারা শুধু তার ভুলগুলোকে চিহ্নিত করে শুধরে দেবার চেষ্টা করুন।

৫. বাইরের লোকজনের সামনে কখনোই আপনার সন্তানকে ভর্ৎসনা করে খাটো করবেন না। তাকে আপনি গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধা-সম্মান আর ছোটদের প্রতি স্নেহপূর্ণ ব্যবহার করতে শেখান। ধর্মচর্চার সাথে জড়িত অন্ধ কুসংস্কার ও মিথ্যা অমূলক ভয়ের কবল থেকে শিশুকে আড়াল করে রাখুন।

৬. বাড়ীতে যখন-তখন ঝগড়াঝাঁটি হলে শিশুদের লেখাপড়ার পরিবেশ বিঘ্নিত হয়। গৃহের পরিবেশে দ্বিচারিতা, অশান্তি বা মাদকাশক্তির চল থাকলে আপনার শিশু আশ্রয়হীন ও আদর্শচ্যুত হয়ে পড়বে। পিতা-মাতার মধ্যেকার মনোমালিন্য ও অশ্রদ্ধার সম্পর্ক শিশুমনে ভয় ও নিরাপত্তাহীনতার জন্ম দেয়।

৭. সন্তানকে দুধ-ঘি-ফলমূল খেতে দিন। কোল্ড ড্রিঙ্কস, জাঙ্ক-ফুড ও ফাস্ট-ফুড থেকে দূরে রাখুন। তাদেরকে প্রতিদিন খেলাধূলা ও শরীরচর্চায় উৎসাহ দান করুন। এতে শরীর ও মনের বিকাশ ঘটে এবং শিশুমনে অনেক উৎসাহ ও এনার্জির জন্ম দেয়। মনে রাখবেন, পরিমিত নিদ্রা ও পরিমিত পানাহার সুস্থ-শরীর ও মনের চাবিকাঠি।

অতিরিক্ত মোবাইল ফোন ব্যবহার বাড়াচ্ছে স্বাস্থ্যঝুঁকি

মোবাইল ফোন ছাড়া এ যুগে জীবন অচল। কথা বলা ছাড়াও ইণ্টারনেট ব্যবহার, গান শোনা, ভিডিও দেখা, ছবি তোলা, মিনি-কম্পিউটার হিসাবে এর ব্যবহার সুবিদিত। সবার হাতে হাতে তাই আজ সুদৃশ্য রঙীন নানান রকমের সেলুলার ফোন। কিন্তু এই ফোনের অতিব্যবহার থেকে যে সব স্বাস্থ্য-সমস্যা হতে পারে, সে ব্যাপারে সচেতন থাকাও জরুরী। আর জেনে রাখা দরকার ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক রশ্মি বিচ্ছুরণের কারণে উদ্ভুত শারীরিক ও মানসিক সমস্যাগুলো থেকে নিজেকে রক্ষা করার উপায়। প্রতিরোধ সম্পর্কে সচেতনতা আমাদের অনেক বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারে।

১. রেডিয়েশান কার্সিনোজেনিক ঃ দ্য ইণ্টারন্যাশানাল এজেন্সি ফর রিসার্চ অন ক্যানসার (IARC)-এর গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্ত হল, মোবাইল ফোনের রেডিও-ফ্রিকোয়েন্সি খুবই উচ্চমানের কার্সিনোজেনিক। এই রেডিয়েশান থেকে ব্রেণ ক্যানসার ও আই ক্যানসার হবার সম্ভাবনা আছে।

২. কানের সমস্যা ঃ ফোনে একটানা অনেকক্ষণ কথা বলতে অভ্যস্ত যারা, তাদের ইনার ইয়ার ড্যামেজ ও ককলিয়ার সমস্যা দেখা দিতে পারে। এছাড়া হেয়ারিং লস্-এর সমস্যাও হতে পারে। ইউরোপের 'বায়োইলেকট্রোম্যাগনেটিক্স'-এর একদল বিজ্ঞানীরা বলেছেন, বাঁ দিকের কানে ফোন ধরে কথা বলতে। এতে ব্রেণের ক্ষতি কম হয়। এই মত সমর্থন করে অ্যামেরিকান একাডেমী অফ্ অটোল্যারিঙ্গোলজি (AAA)-এর গবেষকরা জানিয়েছেন, ডানদিকের কানে ফোন ধরে কথা বললে মস্তিষ্কে সরাসরি ক্ষতি হবার সম্ভাবনা বেশী থাকে।

৩. ব্রেণ ডিজিজ ঃ মোবাইল ফোনের বিচ্ছুরণ থেকে মাথায় যন্ত্রণা, মাথা-ঘোরা ছাড়াও ব্রেণ-টিউমারও হতে পারে। অ্যাকাউস্টিক নিউরোমা, ম্যালিগন্যান্ট গ্লিয়োমা ইত্যাদির সম্ভাবনার কথাও গবেষক মহলে জোর চর্চা হতে শোনা যায়। উল্লেখ্য, এইসব বিভিন্ন ধরণের ব্রেণ-টিউমার হবার প্রবণতা বড়োদের থেকে ছোটদের বেশী থাকে। সুইডেন-এর ওরিব্রো-হসপিটাল-এর গবেষণা থেকে জানা যাচ্ছে – ছোটদের ব্রেণ-এর 'স্কাল বোন ডেনসিটি' (Skull Bone Density) কম থাকে আর ব্লাড ব্রেণ ব্যারিয়ার (Blood Brain Barrier) কম কার্যকরী থাকে বলে তিনগুণ বেশী রেডিয়েশান শোষণ করতে পারে। ছোট ছেলে-মেয়েদের তাই মোবাইল ব্যবহার করতে না দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

৪. হোয়াটস অ্যাপাইটিস ঃ নববর্ষে হোয়াটস অ্যাপ সার্ভিসের মাধ্যমে প্রিয়জন, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের আপনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা মেসেজ করলেন। সন্ধ্যাবেলা দেখলেন আপনার কাঁধ-কব্জি-ঘাড়ে খুব ব্যাথা-যন্ত্রণা হতে শুরু করেছে।

৫. চোখ ও দৃষ্টিশক্তির সমস্যা ঃ অনেকক্ষণ ধরে মোবাইলে নেট ঘাঁটলে নানাবিধ স্ক্রীন ভিশন সিনড্রোম (Screen Vision Syndrome) দেখা দেয়। যেমন, চোখ লাল হওয়া ও জ্বালাভাব, আই-স্ট্রেন, ড্রাই-আই, আই ইরিটেশান, ঝাপসা দৃষ্টি (blurred vision), রাতকানা (night blindness) ইত্যাদি হতে পারে।

৬. রিপ্রোডাক্টিভ সিস্টেম-এর সমস্যা ঃ মোবাইল ফোন থেকে নিঃসৃত হয় পারফ্লুউরো-অকট্যানোইক অ্যাসিড (Perflurooctanoic Acid) নামক এক ক্ষতিকারক কেমিক্যাল, যা থেকে স্ত্রী জননতন্ত্রের কার্যক্ষমতা ব্যহত হয়। এর থেকে এমনকি ইউটেরাস, ওভারি, ফ্যালোপিয়ান টিউব ইত্যাদির গঠণতন্ত্রে ক্ষতি হতে পারে। সন্তানধারণ কালে যে সমস্ত নারী অত্যধিক মোবাইল ফোন ব্যবহার করেন, তাদের ভূমিষ্ঠ সন্তান পরবর্তীতে এ.ডি.এইচ.ডি. (ADHD)-র মত বিহেবিয়ার প্রবলেমের শিকার হতে পারে। পুরুষদের ক্ষেত্রে প্রজনন-সংক্রান্ত সমস্যা দেখা দিতে পারে। যেমন, স্পার্ম কাউন্ট ও স্পার্ম মটিলিটি কমে যেতে পারে, এমনকি অক্সিজেন-সমৃদ্ধ রিঅ্যাকটিভ মলিক্যুলার প্রজাতির স্পার্মগুলোর ডি-অক্সিরাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড (DNA) ড্যামেজ হয়ে স্পার্ম মর্ফোলজি বিবৃত হয়ে যেতে পারে।

৭. মানসিক সমস্যা ঃ অত্যধিক সেল-ফোন ব্যবহার থেকে মানসিক ক্লান্তি, ডিপ্রেশান বা মানসিক অবসাদ, ইনসমনিয়া বা ঘুমের সমস্যা হতে পারে। ক্ষেত্রবিশেষে মনোযোগ ও স্মৃতিশক্তির ধারণক্ষমতা (retention of memory) কমে যাওয়ার ঘটনাও ঘটতে পারে।

৮. রিং-টোন অ্যাংজাইটিঃ মাত্রাধিক মোবাইল আসক্তির কুফলে এই মানসিক সমস্যা হতে পারে। এই সমস্যায় আক্রান্ত ব্যক্তি ছোটখাটো যে কোন শব্দে সতর্ক হয়ে পড়ে, ভাবে, মনে হয় তার মোবাইলের রিং-টোন বাজছে। অনেকে এমনও আছেন, এক-দুঘণ্টা ফোন না আসলে যারপরণাই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন।

৯. নো-মোবাইল ফোবিয়াঃ ব্যক্তিগত জীবনের যাবতীয় তথ্য, দরকারী কন্ট্যাক্ট নম্বর ইত্যাদি সবই এখন মোবাইলে রাখা থাকে। এই আতঙ্কে আক্রান্ত ব্যক্তি সর্বদা ভয়বিহ্বল হয়ে থাকে, এই বুঝি তার সেলফোনটা হারিয়ে গেল।

১০. সোশ্যাল সাইট অ্যাডিকশন ঃ জনপ্রিয় স্মার্টফোনের কল্যাণে আমরা ফেসবুক, অর্কুট, ট্যুইটার, লিংকড-ইন ইত্যাদি সোশ্যাল সাইটে মাত্রাছাড়া আসক্ত হয়ে পড়ছি। এই অ্যাডিকশন থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনার ক্ষতি হয়, বড়দের ঘুমের সমস্যা দেখা দেয়।

১১. মেমরি প্রবলেম ঃ ফোনে বেশী কথা বলায় অভ্যস্ত যারা, তাদের মস্তিষ্কে গ্লুকোজ ধারণ (brain glucose consumption) কম হয়। যার ফলে স্প্যটিয়াল ওয়ার্কিং মেমরি ব্যহত হয়।

১২. অন্যান্য সমস্যা ঃ মোবাইল ফোনের অতিব্যবহার থেকে ঘাড়ের যন্ত্রণা, পিঠ ও কোমরের যন্ত্রণা, জয়েণ্ট-পেন, ট্যকিকার্ডিয়া বা হৃৎপিণ্ডের গতি অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পেতে পারে।

প্রতিকারের উপায়

১. মোবাইল ফোন হচ্ছে কম পাওয়ারের রেডিও-ফ্রিকোয়েন্সি ট্রান্সমিটার, যা ৪৫০ থেকে ২৭০০ মেগাহার্জ (MHz) বিচ্ছুরণ ঘটায়। ৩০-৪০ সেন্টিমিটার দূরে রেখে মোবাইল ব্যবহার করলে রেডিয়েশানের ভয় থাকে না।

২. শরীর থেকে ফোন যথাসম্ভব দূরে রেখে কথা বলার অভ্যাস করলে, কান ও হাতে স্কিন ক্যানসারের ভয় থাকে না।

৩. স্পীকার অন্ করে মোবাইলে একটু দূর থেকে কথা বলার অভ্যাস করতে পারলে ভালো।

৪. তার-যুক্ত হেড-সেট ব্যবহার করার চেষ্টা করুন।

৫. কানে ব্লু-টুথ লাগিয়ে কথা বলা নিরাপদ নয়। কারণ ব্লু-টুথ থেকে সমমাত্রার রেডিয়েশান নির্গত হয়।

৬. টেক্সট মোর, টক লেস (text more, talk less) - ছোট ছোট তথ্য আদান-প্রদানের জন্যে ফোন না করে টেক্সট মেসেজ করুন। ইণ্টারনেট অ্যাকসেস-এর সুযোগ থাকলে মেল করে ভাব-বিনিময় করা যেতে পারে।

৭. বুক পকেটে মোবাইল রাখবেন না।

৮. মোবাইলে সিগন্যাল যখন কম থাকে তখন রেডিয়েশান বেশী হয়। সেজন্যে বদ্ধস্থানে ফোন করবেন না।

৯. মোবাইল ফোন কেনার সময় SAR নম্বর (Specific Absorption Rate) দেখে কিনবেন। SAR লেভেল ১.৬ ওয়াট পার কিলোগ্রামের কম হলে তবেই তা নিরাপদ। মনে রাখবেন, SAR নম্বর যত কম হবে তত ভালো।

১০. বেড-টাইম মোবাইল কারফিউ — কেউ কেউ রাতে শুতে যাবার আগে মোবাইল নিয়ে ঘাঁটাঘাটিতে অভ্যস্ত। ঘুমের দফারফা আটকাতে এই কুঅভ্যাস ত্যাগ করতে হবে।

১১. ফেসবুক হলিডে — এক দু মাস পরে পরে অন্তত পক্ষে দিন তিনেক মোবাইলে ফেসবুক ব্যবহার থেকে বিরত থাকুন।

১২. সোশ্যাল মিডিয়া ফাস্টিং — দশদিন অন্তর অন্তর সম্পূর্ণ একটা দিন সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার থেকে দূরে রাখুন।

১৩. ইউজ মোবাইল হোয়েন ইউ আর মোবাইল — আপনি যখন বাইরে কাজে-কর্মে আছেন তখন পরিমিত মোবাইল ব্যবহার করুন। ঘরে থাকলে ল্যাণ্ড-লাইনে কথাবার্তা বলুন।

১৪. সারা দিনে এক থেকে দেড় ঘণ্টার বেশি মোবাইলে কথা বলবেন না।

১৫. ডিসইনফেক্ট ইওর মোবাইল — বিভিন্নভাবে আপনার মোবাইলে নানা ধরণের জীবাণু বাসা বাঁধে। সঠিকভাবে প্রতিদিন সেলফোনকে জীবাণু মুক্ত করতে হবে।

১৬. দেহের ইমিউনিটি সিস্টেম শক্তিশালী করুন — বিভিন্ন ধরণের অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট-সমৃদ্ধ খাবার আমাদের দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে অটুট রাখে। বিটা ক্যারোটিন-সমৃদ্ধ গাজর, ক্যুরকামিন-সমৃদ্ধ হলুদ, ফাইটো-নিউট্রিয়েন্ট অ্যালিসিন-সমৃদ্ধ রসুন ইত্যাদি মানবদেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে বিবিধ মারণরোগের প্রভাবমুক্ত রাখে। আনারসের ব্রোমেলোইন, ইমিউন বুস্টিং অ্যামাইনো অ্যাসিডদের কার্যক্ষমতাকে অটুট রাখে। বাজারে পাওয়া গেলে কাঁচা আমলকী, কাঁচা গাজর, আনারস খান। সপ্তাহে অন্তত তিনদিন ২ চামচ করে কাঁচা হলুদের রস খান। রাত্রে ডিনারের সাথে সপ্তাহে ২ দিন এককোয়া রসুন খেতে পারেন। এছাড়া, স্ট্রবেরী, জিনসেং, জিংকো বাইলোবা ইত্যাদি খেতে পারলে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা শক্তিশালী থাকে।

মানসিক স্বাস্থ্যকে অবহেলা করলে মানবসভ্যতা সংকটে পড়বে

১০ অক্টোবর, আন্তর্জাতিক মানসিক স্বাস্থ্য দিবস। শারীরিক স্বাস্থ্যের পাশাপাশি মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষায় সর্বাত্মক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলন গড়ে তোলার শপথ নেবার দিন এসেছে আজ। সুস্থ সমাজজীবনের স্বার্থে চিকিৎসক-সমাজ, মনোবিদ ও মানসিক স্বাস্থ্যকর্মীদের পাশাপাশি সমাজের সর্বস্তরের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে এই আন্দোলনে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সামিল হবার আহ্বান জানাচ্ছি।

বর্তমান শতাব্দীতে আমরা সবাই ঘরে-বাইরের প্রবল মানসিক চাপে বিপর্যস্ত। আদর্শ ও নৈতিকতার সংকট আজ সর্বগ্রাসী। সামাজিক মূল্যবোধের অধঃপতন আর ধর্মীয়-আধ্যাত্মিক সাংস্কৃতিক চিন্তা-চেতনার অবনমনের জন্যে আমাদের মানসিক শক্তি ক্রমাগত ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। অনেকের মনের আকাশে জমছে দুশ্চিন্তা-উদ্বেগ ও অবসাদের কালো মেঘ। সভ্যতার এই ঘনঘোর সংকটে মেঘমুক্ত রৌদ্রকরজ্জ্বল সকালের সন্ধানে আমাদের সবাইকে আজ মানসিক স্বাস্থ্য-আন্দোলনের মহান পতাকাকে বহন করে এগিয়ে যেতে হবে।

বর্তমান বিশ্বে মানসিক স্বাস্থ্য-সমস্যার পরিসংখ্যান

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সর্বশেষ পরিসংখ্যান থেকে জানা যাচ্ছে, বর্তমানে পৃথিবীতে প্রতি ৪ জন মানুষের মধ্যে ১ জন মানসিকভাবে অসুস্থ। বিশ্ব জুড়ে কম-বেশী ৪৫০ মিলিয়ন নারী-পুরুষ মনোবিকার ও মানসিক রোগের শিকার। শতাংশের হিসাবে এই হার সর্বাধিক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কলম্বিয়া, ইউক্রেন, ইন্ডিয়া, নেদারল্যান্ড প্রভৃতি দেশে। বিপরীত পক্ষে, উল্লেখযোগ্যভাবে সবচেয়ে কম মনোরোগীর সংখ্যা জাপান, ডেনমার্ক, ফিনল্যান্ড প্রভৃতি দেশে। ২০১৭ সালের বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্যদিবসের শ্লোগান ছিল –'মেন্টাল হেলথ ইন দ্য ওয়ার্ক প্লেস' অর্থাৎ কর্মস্থলে মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষা। প্রতি বছর ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অফ্ মেন্টাল হেলথ (WFMH) এরকম এক একটি বিষয়বস্তু নির্বাচন করে। বর্তমান যুগে শুধু কর্মস্থলে নয়, সমাজ-জীবনের সর্বক্ষেত্রে মানসিক স্বাস্থ্যের অবনতি র কারণে ভেঙে যাচ্ছে সুস্থ মানবিক সম্পর্ক, ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনের আশা-আকাঙ্খা। আবালবৃদ্ধবণিতা আমরা অনেকেই আজ বিধ্বস্ত ও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত। সমাজের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের স্বার্থে এর থেকে আশু মুক্তির পথ খুঁজতে হবে আমাদেরকেই।

মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষায় শিক্ষক-সমাজের দায়িত্ব

সাধারণ মানুষের মধ্যে মনোরোগ ও মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে বিজ্ঞান-ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রচণ্ড অভাব। জনমানসের এই অজ্ঞতা ও অজ্ঞানতাই বিবিধ মানসিক রোগের প্রতিকার ও

সামগ্রিক মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতির ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড়ো অন্তরায়। এই বাধা অতিক্রম করার ক্ষেত্রে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের আন্তরিকভাবে এগিয়ে আসতে হবে। শৈশব, কৈশোর, বয়ঃসন্ধি ও যৌবনের ঊষালগ্নে ছাত্র-ছাত্রীরা নানান জটিল মানসিক সংকট ও মানসিক দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মুখোমুখি হয়। তখন তাদের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হয় উপযুক্ত নির্দেশ আর সাহচর্যের। এ ব্যাপারে সঠিক পথের দিশা দেখাতে পারেন শিক্ষক মহাশয় – যাহার প্রদর্শিত পথে ছাত্র-ছাত্রীরা লাভ করবে মন ও মানসিক বিষয়ে বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান। আর সেই জ্ঞানের আলো ছাত্র-ছাত্রীদের মাধ্যমে তাদের পরিবারে এবং বৃহত্তর সমাজে ছড়িয়ে পড়বে।

আমরা এখন এক চূড়ান্ত সামাজিক-সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের যুগে বাস করছি। যার ফলস্বরূপ বাল্যকাল, কৈশোর বা বয়ঃসন্ধিকালের একটি ছেলে বা মেয়ে তার চারপাশের অসুস্থ মানসিক পরিবেশ থেকে বিকৃতির দীক্ষা পেয়ে যাচ্ছে। তার অবচেতন মনে গৃহীত সেইসব বিকৃতির প্রভাবে ক্রমশঃ সে উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা আর মনোবিকারের উন্মাদনায় ছটফট করতে থাকে। মানসিক এই স্বাস্থ্যহানির কারণে কেউ কেউ বাস্তব থেকে পালিয়ে কল্পনার জগতে বাস করতে করতে অলীক কাল্পনিক বাতুলতায় (স্কিজোফ্রেনিয়া) আক্রান্ত হয়ে পড়ে। কেউবা আবার অপরাধপ্রবণ হয়ে অবশেষে অসামাজিক ব্যক্তিত্ব বিকার (অ্যান্টি-সোস্যাল পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডার)-এর শিকার হয়ে পড়ে। অনেকে আবার জীবনে না পাওয়ার হতাশা থেকে মানসিক অবসাদে (মেন্টাল ডিপ্রেশন) আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়।

দেড় দশকের বেশী সময় ধরে স্নায়ু-মনোরোগ চিকিৎসা করার সুবাদে এছাড়াও শিক্ষার্থীদের নানান মানসিক সমস্যার কথা অভিভাবকদের মুখে শুনে আসছি। কেউ বলছেন, তাঁর সন্তানের অস্বাভাবিক আচরণের বিকার-জনিত সমস্যার কথা। কেউবা বলছেন, অতি চঞ্চলতা, প্রচণ্ড রাগ ও বদমেজাজ, উগ্রস্বভাব, অপরাধপ্রবণতা ইত্যাদি সমস্যার কথা। কারুর মুখে শুনছি কাল্পনিক ভয়, চুরির বাতিক, নেশা-আসক্তি, মোবাইল ফোন অ্যাডিকশন প্রভৃতি সমস্যার কথা। ছাত্র-ছাত্রীদের এইসব মানসিক সমস্যার নিরসনে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক মহাশয় যদি সহৃদয় মানবিক আচরণ নিয়ে পরামর্শদাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হন, তাহলে অনেক উৎকণ্ঠিত ও উদ্বিগ্ন অভিভাবকগণের চোখের জল মোছানো সম্ভব হবে। পাশাপাশি, মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষা বিষয়ক কুসংস্কার এবং মানসিক রোগ বিষয়ক অজ্ঞতা থেকে সমাজ অনেকাংশে মুক্ত হবে। আর এই মুক্তির পথপ্রদর্শক হতে হবে আমাদের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক সমাজকে। চিরকাল সমাজে শিক্ষকের একটি বিশিষ্ট সম্মানীয় স্থান আছে। শিক্ষকের শিক্ষাদানের ক্ষেত্র শুধুমাত্র বিদ্যালয়ের পরিধির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় – তার ক্ষেত্র বৃহত্তর সমাজ-মানসে বিস্তৃত। মানসিক স্বাস্থ্য আন্দোলনে আমরা তাই সর্বস্তরে শিক্ষক সমাজের আন্তরিক অংশগ্রহণ প্রার্থনা করি।

মনোবিকার ও মানসিক রোগ কেন হয়

মস্তিষ্কের রাসায়নিক ডোপামিন, সেরোটোনিন ইত্যাদির বিপাকক্রিয়ার গোলযোগ থেকে বহুবিধ মনোরোগ প্রকাশ পায়। ব্রেণ নিউরো-ট্রান্সমিটারগুলোর অস্বাভাবিকতা থেকে আমাদের

আবেগ জীবনের নিয়ন্ত্রণ শিথিল হলে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে মানসিক বিকারে আক্রান্ত হয়। ব্যক্তির কামনা-বাসনার সাথে তার প্রকৃত সামর্থ্যের সামঞ্জস্য না থাকলে, সে মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে। অত্যধিক নেশার সামগ্রী সেবনে আমাদের মানসিক স্বাস্থ্যের অবনতি হয়। সর্বগ্রাসী সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের কারণে নৈতিক অধঃপতন এবং তার থেকে মানসিক স্বাস্থ্যহানির ঘটনা বর্তমান শতাব্দীতে অভিশাপ হয়ে নেমে এসেছে। এছাড়া দারিদ্র, বেকারত্ব, ঋণগ্রস্থ অবস্থা, সাম্প্রতিক সমস্যায় জর্জরিত হয়ে ক্রমাগত ঃ মানসিক চাপ, বৈবাহিক জীবনে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অশান্তি ও দাম্পত্যকলহ ইত্যাদি কারণে সমাজের মানসিক স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ছে।

মানসিক স্বাস্থ্যের অবনতিতে কি কি রোগ হয়

১. স্কিজোফ্রেনিয়া বা অলীক কাল্পনিক বাতুলতা – এই রোগে আক্রান্ত হলে রোগী বাস্তব জগৎ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে কল্পনার জালে বন্দী করে রাখে। আবেগ জীবনের শূন্যতা থেকে সব বিষয়ে নিরাসক্ত ভাব দেখা দেয়, তখন রোগীর বেঁচে থাকার আনন্দ সম্পূর্ণ লোপ পায়। এমনকি স্নানাহার, নিদ্রা, প্রস্রাব-পায়খানা প্রভৃতি জৈবিক চাহিদাগুলিতেও রোগী সাড়া দেয় না, যেন সে জড় পদার্থে পরিণত হয়।

২. অবসেসিভ কম্পালসিভ ডিসঅর্ডার (ও.সি.ডি.) বা বাতিক রোগ – এর লক্ষণ হিসাবে দেখা দেয় সংশয় ও সন্দেহ। রোগীর মাথায় বিশেষ বিশেষ রোগ সম্পর্কে ভয়মিশ্রিত চিন্তা বারংবার দেখা দেয়। সন্দেহ ও সংশয়ের বশে এরা একই কাজ বারংবার করে। হয়তো তরজায় তালা বন্ধ করেছে, ঘরের লাইট-পাখা বন্ধ করেছে – তবুও তারা বারংবার পরীক্ষা করে দেখে কাজটি তারা করেছে কিনা। চিঠি ডাকবাক্সে ফেলে এদের মনে হয় চিঠি বোধহয় ফেলা হয়নি। রাস্তা দিয়ে যাবার সময় এরা প্রত্যেকটা ল্যাম্পপোস্টকে স্পর্শ না করে এগিয়ে যেতে পারে না। কোনো গন্তব্যস্থলে যাবার পথে নিজের ধর্মের যত মন্দির বা মসজিদ পড়ে, সর্বত্র তার মাথা নোয়ানো চাই-ই চাই। ওয়াশিং ম্যানিয়া বা ধোয়ার বাতিক এই রোগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

৩. অ্যাংজাইটি নিউরোসিস বা মানসিক উৎকণ্ঠা – এই রোগে আক্রান্ত রোগী অমূলক ভয়, আশঙ্কা, অস্থিরতা ও চাপা উত্তেজনায় ছটফট করতে থাকে। ভবিষ্যতের আসন্ন বিপদ তাঁর মনের আকাশকে মেঘাচ্ছন্ন করে রাখে। নানান চিন্তার ভারে তিনি যখন-তখন মানসিকভাবে ক্লান্ত-অবসন্ন-বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন। রোগীর সবসময় দুশ্চিন্তা গ্রাস করে – এই বুঝি তিনি দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন বা খুব শীঘ্রই তিনি হয়তো ক্যানসার-এডস্ জাতীয় কোনো মারণরোগে আক্রান্ত হয়ে পড়বেন, ইত্যাদি। অতি তুচ্ছ ও সাধারণ বিষয়েও অনেকে অমূলক দুর্ভাবনা বা অহেতুক উৎকণ্ঠায় নিমজ্জিত হয়ে পড়েন। প্রচণ্ড মানসিক উৎকণ্ঠায় রোগী ভয় পেতে থাকেন, তিনি বোধহয় অচিরে পাগল হয়ে যাবেন। এইসব বহুবিধ আশঙ্কা আর উৎকণ্ঠার শারীরিক অভিব্যক্তি হিসাবে রোগীর মধ্যে দেখা দেয় বুক-ধড়ফড়ানি, দম বন্ধ হয়ে যাবার অনুভূতি, দেহের নানান অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে কাঁপুনি, মাথা ঝিমঝিম করা ইত্যাদি।

৪. এ.ডি.এইচ.ডি. ও ইনফ্যানটাইল অটিজম – ছোটদের এই মানসিক সমস্যায় অতিরিক্ত রাগ, বদমেজাজ, অতি শয় চঞ্চলতা খামখেয়ালিপনা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। এরা অকারণে অপ্রাসঙ্গিক কথাবার্তা বলে এবং পিতা-মাতা ও স্কুলে শিক্ষক মহাশয়দের অবাধ্য হয়। এরা যখন যা বায়না করবে তখনই তা না পেলে, হাতের সামনে যা জিনিসপত্র পাবে তা ছিঁড়তে বা ভাঙতে থাকে। নিজের মাথার চুল ছিঁড়তে শুরু করে, মা-বাবার গায়ে হাত তোলে, কেউ কেউ এমনকি মুখ খারাপও করে বসে। এদের বুদ্ধিবৃত্তি যে অপরিণত হয় তা নয়, কিন্তু উত্তেজিত স্বভাবের জন্যে এদের কোনোকিছু শেখানো খুবই মুশকিল হয়ে পড়ে।

৫. ম্যানিয়া ও ফোবিয়া বা আতঙ্ক – ম্যানিয়ায় আক্রান্ত রোগী কোনো এক জায়গায় স্থির থাকতে পারে না, সবসময় ছটফট করে। অযথা অকারণে অনর্গল বকবক করে কথা বলে, মিনিটে মিনিটে এক বিষয় থেকে অন্য বিষয়ে চলে যায়। এছাড়া, চুরির বাতিক, কামবাতিক ইত্যাদি নানান ধরণের ম্যানিয়ায় মানুষ আক্রান্ত হতে পারে। অ্যাকিউট ডিলিরিয়াস ম্যানিয়ায় আক্রান্ত রোগী স্থান-কাল-পাত্র জ্ঞান হারিয়ে ফেলে, নিজের লজ্জা-শরম বোধও লোপ পায়। অর্থশূন্য প্রলাপ বকতে বকতে রোগী উত্তেজনা-উন্মাদনায় মারমুখী হয়ে ওঠে আর হাতের সামনে যা পায় তা ভাঙচুর করে।

আতঙ্কে আক্রান্ত রোগী শুধু শুধু কোনো বস্তুকে ভয় পায়। অনেকে পরাজয়ের অপমান-গ্লানি থেকে নানা ধরণের ফোবিয়ার শিকার হয়। অনেকে আবার টিভিতে ভয়াবহ বিস্ফোরণের দৃশ্য দেখে প্রতীকরূপে বারুদে ভয় পায়, কেউ কেউ বা গুলিবিদ্ধ মানুষের হৃদয়-বিদারক আর্ত চিৎকার শুনে ও দেখে বন্দুকে ভয় পায়। এছাড়া, মৃত্যুভয়, রক্ত দেখলে ভয়, বদ্ধস্থানের ভয়, উচ্চস্থানের ভয়, বিশালদেহী জীবজন্তু দেখে ভয়, ভিড় ট্রেনে-বাসে ওঠার ভয়ে মানুষ আতঙ্কিত হয়।

৬. ডিপ্রেসিভ সাইকোসিস বা মানসিক অবসাদ – হঠাৎ করে নিজের ভিতরে অস্থিরতা, অকারণে মন খারাপ করা, অবাস্তব নেতিবাচক চিন্তা করা, সবকিছুতেই উৎসাহ-উদ্যম হারিয়ে ফেলা প্রভৃদি হল বিষন্নতা ও অবসাদের প্রাথমিক লক্ষণ। এতে রোগীর আনন্দ পাবার অনুভূতি ভোঁতা হয়ে যাবার কারণে দৈনন্দিন কাজকর্মের আগ্রহ কমে যায়। সবকিছুতে প্রচণ্ড হতাশা ও নিরাশা প্রবলভাবে গ্রাস করে। আগের ভালোলাগা জিনিস তখন আর একদম ভালো লাগে না। রোগ প্রিয় বন্ধুদের এড়িয়ে চলে, নিজের একান্ত শখের জিনিসের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলে, পছন্দের টিভি সিরিয়াল বা অন্যান্য অনুষ্ঠানগুলো আর দেখতে ও বসে না। সবকিছুতেই খিটখিটে মেজাজ, বিরক্তি ভাব, সারাদিন শুয়ে-বসে কাটাতে মন চায়, খিদে ও পিপাসা কমে আসে, রাগে ছটফট করে, ভালোভাবে ঘুমাতে পারে না। কেউ কেউ প্রবল অবসাদে আত্মহত্যার কথাও ভাবে।

৭. প্যারানয়েড ডিসঅর্ডার বা ভ্রমবাতুলতা – এতে আক্রান্ত রোগী সর্বদা মনে করে অন্যেরা তার ক্ষতি করার চেষ্টা করছে বা তার সম্পর্কে অশ্লীলভাবে বলাবলি করছে। এরা

সবসময় অন্যের দোষ খুঁজে বেড়ায় আর তিলকে তাল করে অনর্থক ঝগড়া-ঝাঁটি বাধায়। এরা এতটাই সন্দেপ্রবণ হয় যে, ভাবে কেউ কেউ তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে অথবা অন্যে তার খাবারে বিষ মিশিয়ে দিচ্ছে। অনেক রোগীর দাম্পত্যজীবন নিয়ে মিথ্যা বিশ্বাস ও ভ্রান্ত ধারণা দেখা দেয় – দম্পতির একজন অন্যজনের একনিষ্ঠতা সম্বন্ধে সর্বদা সন্দেহ প্রকাশ করতে থাকে।

এছাড়া ম্যুড ডিসঅর্ডার, বয়ঃসন্ধিক্ষণের বিষন্নতা, হিস্টিরিয়া, বাইপোলার ডিসঅর্ডার, বর্ডার লাইন পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডার, আবেশিক বায়ুরোগ, অসামাজিক আগ্রাসী আচরণ, ভ্রান্তিমূলক চিত্তভ্রংশী বাতুলতা ইত্যাদি জটিল মনোবিকারে বিশ্বের কোটি কোটি নর-নারী জেরবার হয়ে চলেছে।

মানসিক স্বাস্থ্য ভালো রাখতে কী কী করণীয়

১. সকলের সঙ্গে সুমধুর সম্পর্ক রাখুন – আপনার চারপাশের সমস্ত মানুষজনের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখুন। মানুষে মানুষে সম্পর্কের অবনতি থেকে বেশীরভাগ দুশ্চিন্তা আর মানসিক অশান্তির জন্ম হয়। পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন,পাড়া-প্রতিবেশী, অফিস-আদালত , কর্মস্থলে সবার সাথে আচার-আচরণে আন্তরিক হলে, পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও বিশ্বস্ততা বজায় রাখলে মানসিক উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার কবলে পড়তে হয় না।

২. ভবিষ্যতের জন্যে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা করুন – শুধুমাত্র আর্থিক অনটনের কারণে অসংখ্য মানুষ মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। সেজন্যে রোজগার শুরু করার সময় থেকে পরিবারের জন্যে ভবিষ্যতের কথা ভেবে সঠিকভাবে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা করুন। আপনার আয় থেকে উদ্বৃত্ত অংশ সাধ্য অনুযায়ী ভবিষ্যতের জন্যে সঞ্চয় করলে পরবর্তীকালে কোনোদিন অর্থনৈতিক সংকটের মুখোমুখি হতে হবে না। সমাজে অনেক মানুষকে আমরা দেখেছি, এককালে দু'হাতে প্রচুর উপার্জন করেছেন – কিন্তু অপচয়ের মানসিকতা আর সঠিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনার অভাবে শেষজীবনে তাঁরা অভাব-অনটনে শোচনীয় দুঃখ-কষ্টে দিনাতিপাত করেছেন।

৩. মদ ও অন্যান্য নেশার সামগ্রী থেকে দূরে থাকুন – বিড়ি, সিগারেট, ড্রাগস্ আর মদের নেশা ডেকে আনে মানসিক অবসাদ। মাদকাসক্তের মধ্যে অবসাদের কারণে আত্মহননের প্রবণতাও বেশী। এছাড়া, অ্যালকোহল আর নার্কোটিকস্-এর প্রভাবে প্যারানয়েড ডিল্যুশন, হ্যালুসিনেশন, অ্যাফেক্টিভ ডিসঅর্ডার ইত্যাদি মনোবিকার দেখা দিতে পারে। তাছাড়া, নেশার বিষময় প্রভাবে পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্ক নষ্ট হয় – একথা আমরা সবাই জানি।

৪. নিয়মিত ব্যায়াম, যোগাসন ও প্রাণায়াম অভ্যাস করুন – শরীর ভালো থাকলে তবেই মন ভালো থাকে। মন ভালো থাকলে তবেই মনের অশান্তি, দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ ইত্যাদি সুচারুভাবে মোকাবিলা করা যায়। ব্যায়াম ও যোগাসন মনকে আনন্দ উচ্ছল রাখে, মনকে চাপমুক্ত-ভারমুক্ত রাখে, মনের সুস্থিরতা বজায় রাখতে সাহায্য করে।

৫. বিশেষ বিশেষ মানুষকে মনের কথা খুলে বলুন – মনের দুঃখ-কষ্ট লাঘব করার জন্যে সহমর্মী কাউকে মনের কথা খুলে বলুন। এক্ষেত্রে যিনি আপনাকে সৎ ও গঠনমূলক পরামর্শ দিতে পারেন আর প্রয়োজনে সাহায্য-সহযোগীতা করতে পারেন – এমন মানুষকে নির্বাচন করুন। মন খুলে কথা বললে মন হালকা হবে, ভারমুক্ত হবে, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা দূর হবে। মনকে চাপমুক্ত রাখতে অবাঞ্ছিত হলেও সেই ঘটনা চেপে রাখবেন না।

৬. ভয়কে জয় করতে শিখুন – সমস্যা যতই জটিল হোক না আগে থেকেই অযথা ভয়-কবলিত হয়ে পড়বেন না। সম্ভাব্য বিপদ থেকে আপনার জীবনে কি কি ক্ষতি হতে পারে তার ভয়ে আগেভাগে ভীত -সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বেন না। যুক্তি দিয়ে ভয়ের কারণ বোঝার চেষ্টা করুন, নিজে না পারলে বিশিষ্ট পারদর্শী কারুর পরামর্শ নিন। কেননা, ভয় থেকে জন্ম নেয় টেনশন ও উৎকণ্ঠা – যার থেকে আপনি হয়ে পড়তে পারেন মানসিকভাবে বিপর্যস্ত, ঘটতে পারে ঘুমের ব্যাঘাত, আপনার মনের শান্তি নষ্ট করে এই ভয় কেড়ে নিতে পারে জীবনের সব আনন্দ। আপনার জীবন-দর্শন সমৃদ্ধ আদর্শকে পাথেয় করে সমাজে মাথা উঁচু করে বাঁচুন। সাহসের সাথে ভয়কে মোকাবিলা করলে নিজের চেষ্টাতেই আপনি ভয়কে জয় করতে পারেন।

৭. সুস্থ ও স্বাভাবিক দাম্পত্য-সম্পর্ক বজায় রাখুন – দাম্পত্য সম্পর্ককে কেন্দ্র করেই পরিবারের সবকিছু আবর্তিত হয়। যে স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য-জীবন ভালোবাসার ও পারস্পরিক শ্রদ্ধার – তাদের ছেলে-মেয়েরা সুস্থ সুন্দর বিকশিত মন নিয়ে বড়ো হয়ে ওঠে। দাম্পদ্য-কলহ আর সাংসারিক মনোমালিন্য সন্তান-সন্ততির মনোবিকাশকে ব্যাহত করে। বিবাহবিচ্ছেদ-এর কারণে নেশাসক্ত একক পিতা বা দ্বিচারিণী মাতার আশ্রয়ে সন্তান বড়ো হলে সে নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে, সমাজজীবনের মূলস্রোতে সহজভাবে মিশতে পারে না। ধীরে ধীরে সেই সন্তান আত্মকেন্দ্রিক শিশু, অলীক কাল্পনিক বাতুলতার রোগী বা প্রবল মানসিক অবসাদে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। এইসব কারণে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা শিশু ও নারীদের মানসিক স্বাস্থ্যের উপর বিশেষভাবে জোর দিতে বলছে।

৮. ঋণ করে ঘি খাবেন না – একান্ত প্রয়োজন ছাড়া টাকা ধার করবেন না। ধার দেবার জন্যে এখন সুদের কারবারি, বিভিন্ন ব্যাঙ্ক ও আর্থিক সংস্থা এগিয়ে আসছে। সামর্থ্যের বাইরে গিয়ে কখনোই এদের থেকে টাকা ধার করবেন না। সময়মতো ঋণ শোধ করতে না পারলে মানসিক নির্যাতনের সম্ভাবনা তৈরী হয়। আর হ্যাঁ, ক্রেডিট কার্ড সাবধানে ব্যবহার করতে ভুলবেন না। ক্রেডিট কার্ডে অনিয়ন্ত্রিত কেনাকাটার ফলে যথাসময়ে টাকা পরিশোধ করতে না পারলে ঋণ আদায়কারী সংস্থার লোকজনের হাতে অপদস্থ ও অপমানিত হতে হবে। সেই মানসিক চাপ সহ্য করতে না পারলে আপনি মানসিক অবসাদের কবলে পড়তে পারেন। এর থেকে আত্মহত্যার মত ঘটনা ঘটা কিছুই অস্বাভাবিক নয়।

মানসিক চাপ থেকে মুক্তির উপায়

১. নিজের সাধ্য ও সামর্থ্যের বাইরে গিয়ে কোনো দায়িত্ব নেবেন না। যথাসময়ে সেই দায়িত্ব পালন না করতে পারলে আপনি মানসিকভাবে চাপে পড়ে যাবেন।

২. মনের উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগ কমানোর ভালো উপায় হল শিশুদের সঙ্গে সময় কাটানো। শিশুসুলভ সরলতায় বন্ধুর মত শিশুদের সাথে মিশলে, আপনার স্ট্রেস ও টেনশন কেটে যাবে।

৩. সুন্দর গন্ধ আমাদের মনে ভালো লাগার অনুভূতি জাগায়। ভালো সুগন্ধি মেখে কেউ পাশ দিয়ে গেলে ভালোই লাগে। ধর্মস্থানে ধূপ ও ফুলের গন্ধ আমাদের মনকে তৃপ্তি ও প্রশান্তিতে ভরিয়ে তোলে। মানসিক চাপ কাটাতে তাই সুগন্ধির জুড়ি নেই। টেনশন কমাতে তাই অ্যারোমা থেরাপি বর্তমান যুগে বহুল সমাদৃত ।

৪. সময়-সুযোগ করে নিয়মিত ভালো গান শুনুন। বিভিন্ন ঘরানার হিন্দুস্তানী শাস্ত্রীয় সংগীত মনের চাপ ও দুশ্চিন্তা কমাতে বিশেষভাবে কার্যকরী।

মানসিক স্বাস্থ্য-সমস্যায় চিকিৎসা কিভাবে করা হয়

মানসিক সমস্যার প্রাথমিক পর্যায়ে সাইকোলজিক্যাল কাউন্সেলিং ও সাইকোথেরাপি টেকনিক-এর সাহায্যে ঔষধ ছাড়া চিকিৎসা করা হয়। এছাড়া, কগনিটিভ বিহেভিয়র থেরাপি, সাইকো-অ্যানালিসিস, ডাইরেক্টিভ কাউন্সেলিং, বিহেভিয়ার মডিফিকেশন, এক্সপ্রেসিভ সাইকোথেরাপি, মিউজিক ও আর্ট সাইকোথেরাপি প্রভৃতি বিভিন্ন মনোচিকিৎসা সাফল্যের সাথে ব্যবহৃত হয়। মনের বিকার যখন রোগের পর্যায়ে চলে যায়, তখন অ্যাণ্টি-সাইকোটিক এ্যালোপ্যাথিক ও হোমিওপ্যাথিক ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা চালিয়ে যেতে হয়। প্রসঙ্গতঃ জানিয়ে রাখি, সঠিক চিকিৎসায় শারীরিক রোগের মতই অধিকাংশ মনোরোগ সম্পূর্ণ নিরাময় সম্ভব। মনের রোগ হওয়া মানে পাগল হয়ে যাওয়া নয়। মন নিয়ে চর্চা করুন, মানসিক স্বাস্থ্য-বিষয়ক পত্র-পত্রিকা পড়ুন, টেলিভিশন মন-সংক্রান্ত অনুষ্ঠান শুনুন – নিজের ভুল ভাঙান, আপনার অভিজ্ঞতার আলোকে অন্যদের সমৃদ্ধ করুন। মন নিয়ে ব্যক্তিগত ও সামাজিক স্তরে সচেতনতাই একমাত্র আমাদের মানসিক স্বাস্থ্যকে অটুট রাখতে পারে।

অতিরিক্ত রাগ কিভাবে সামলাবেন ?

মানুষের সহজাত প্রবৃত্তিগুলোর মধ্যে রাগ অন্যতম। কিন্তু এই রাগ যখন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়, তখন সংসারে ও সমাজ জীবনে তৈরী হয় অশান্তির পরিমণ্ডল। ঘটতে থাকে পারিবারিক বিবাদ, দাম্পত্য মনোমালিন্য, বন্ধুত্বের বিচ্ছেদ ও নৈতিক মূল্যবোধের সংকট।

আমাদের রাগ হয় কেন ?

ব্যক্তিগত জীবনে চাওয়া-পাওয়ার মধ্যেকার অসামঞ্জস্য, পারিবারিক আর্থিক সংকট, অপরিশোধিত ঋণের বোঝা, নিরাশা ও ব্যর্থতার গ্লানি, ঘৃণা-অবজ্ঞা-বঞ্চনা ও সামাজিক অন্যায়-অবিচারের শিকার হওয়া, আধুনিক জীবনযাত্রায় অতিরিক্ত স্ট্রেস ও টেনশন, পারিবারিক হিংসা ও যৌন নির্যাতনের শিকার হওয়া, বেকারত্বের সংকট ও সামাজিক-রাজনৈতিক-ধর্মীয় বৈষম্য প্রভৃতি কারণে মানুষের রাগ মাত্রছাড়া হয়ে যায়।

রাগ কত ধরনের হতে পারে ?

মাত্রাছাড়া রাগের বহিঃপ্রকাশ ২০-২৫ রকমভাবে হতে পারে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ঃ

১. বিহেভিয়ারাল অ্যাংগার ঃ একে আচরণের বিকারজনিত রাগ বলা হয়। আচরণগত ভাবে যারা রাগী প্রকৃতির, তারা অনেক সময় অকারণে রেগে হুলস্থূল বাধিয়ে বসে।

২. প্যারানয়েড অ্যাংগার ঃ ঈর্শা, পরশ্রীকাতরতা ও ব্যক্তিগত নিরাপত্তার অভাববোধ থেকে এই ধরনের বাতুলতামূলক রাগ প্রকাশ পায়।

৩. ক্রনিক অ্যাংগার ঃ চারপাশের মানুষজনের দুর্ব্যবহারে বীতশ্রদ্ধ হয়ে ও নিজের জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মালে দীর্ঘকাল স্থায়ী এই রাগ মাঝে-মধ্যে প্রকট হয়।

৪. অ্যাগ্রেসিভ অ্যাংগার ঃ এই ধরনের আক্রমণাত্মক রাগ থেকে আচরণগত আগ্রাসন ও বিভিন্ন মনোবিকার দেখা দেয়। ভয়ঙ্কর রাগে ব্যক্তির মাথায় খুন চেপে বসে।

৫. প্যাসিভ অ্যাংগার ঃ অশালীন অহংভঙ্গি, ব্যাঙ্গবিদ্রুপের সাহায্যে পরোক্ষভাবে আমরা এই ধরনের রাগ প্রকাশ করি।

৬. জাজমেণ্টাল অ্যাংগার ঃ অকারণে ও উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে কোনো ব্যক্তির উপর অন্যায়-অত্যাচার বা অবিচার সংঘটিত হলে, এই ধরনের বিচারমূলক রাগ প্রকাশ পায়।

৭. ভলাটাইল অ্যাংগার ঃ এই ধরনের রাগ ক্ষণস্থায়ী, কিছুক্ষণ বাদে গলে একদম জল হয়ে যায়।

৮. রিট্যালিয়েটরি অ্যাংগার ঃ শত্রুর প্রতি প্রতিশোধ নেবার বাসনা থেকে যে ধরনের রাগ মনে পুষে রাখা হয়, তাকে বলে প্রতিশোধমূলক রাগ।

৯. ডিপ্রেসিভ অ্যাংগার ঃ মানসিক অবসাদের কবলে বিপর্যস্ত ব্যক্তি আত্মগ্লানিতে ভুগতে ভুগতে কারণে-অকারণে এই ধরনের রাগের প্রকাশ ঘটিয়ে ফ্যালে।

১০. মর‍্যাল অ্যাংগার ঃ চারপাশে ঘটমান সর্বগ্রাসী নৈতিক অধঃপতন ও সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় সহ্য করতে পেরে ব্যক্তি এই ধরনের রাগে ফুঁসতে থাকে।

অনিয়ন্ত্রিত রাগের দৈহিক লক্ষণ কিভাবে প্রকাশ পায়?

লাগামছাড়া রাগের বহিঃপ্রকাশ হিসাবে চোখ-মুখ লাল হয়ে যাওয়া, হাত- পা কাঁপা, বুক ধড়ফড়ানি, ব্লাড-প্রেশার বেড়ে যাওয়া, ঘাড়ে-মাথায় যন্ত্রণা, শরীরে অতিরিক্ত ক্লান্তি ইত্যাদি দেখা দেয়।

মাত্রাতিরিক্ত রাগ, দীর্ঘস্থায়ী হলে কি কি রোগ হতে পারে?

রাগ থেকে ক্ষুধামান্দ্য, হজমের গোলযোগ, কোষ্ঠকাঠিণ্য প্রভৃতি শারীরিক সমস্যা হতে পারে। ভয়ংকর রাগের পরিণতিতে হার্ট অ্যাটাক ও ব্রেণ স্ট্রোকও হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। মাত্রাছাড়া রাগ থেকে নানা ধরনের মানসিক সমস্যাও দেখা দেয়। যেমন, প্যানিক অ্যাটাক, অ্যাংজাইটি নিউরোসিস, ডিপ্রেসিভ ডিসঅর্ডার, বর্ডার লাইন পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডার (বি.পি.ড়ি), ইনসমনিয়া বা অনিদ্রার ইত্যাদি রোগ হতে পারে।

অতিরিক্ত রাগের সময় মস্তিষ্কের স্নায়ু-রসায়ন ও হরমোনের কি ধরনের পরিবর্তন হয়?

অনিয়ন্ত্রিত রাগের সময় পিটুইটারি গ্ল্যাণ্ড থেকে অ্যাড্রেনোকটিকোট্রনিক হরমোন ও অ্যাড্রেনাল কর্টেক্স থেকে কর্টিকোস্টেরয়েড হরমোন নিঃসৃত হয়। সেই সময় মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাস থেকে অক্সিটোসিন, ভ্যাসোপ্রেসিন ও কর্টিকোট্রপিন হরমোনের অতিরিক্ত ক্ষরণ হতে থাকে। এইসব হরমোনের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাবে ব্রেণ নিউরো-কেমিস্ট্রি-তে অদ্ভুত কিছু পরিবর্তন হয়। মানব-মস্তিষ্কের প্রি-ফ্রণ্টাল কর্টেক্স হল আবেগ নিয়ন্ত্রণকারী অংশ, যার বামদিকের অংশের কাজ হল ইমোশনাল কন্ট্রোল বা আবেগগত নিয়ন্ত্রণকে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা। যে সব নারী-পুরুষের এই প্রি-ফ্রণ্টাল অংশ যত শক্তিশালী তাদের ক্রোধ সংবরণ ও আবেগ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা তত বেশী। আমাদের মস্তিষ্কের ইমোশনাল সেণ্টার হল লিম্বিক সিস্টেম-এর মধ্যেকার অ্যামাইগজলা নামক অংশ, যেখান থেকে নিঃসৃত সেরোটোনিন নামক স্নায়ু-রাসায়নিকের মাত্রার তারতম্য থেকে মাত্রাছাড়া রাগের বহিঃপ্রকাশ হয়। মস্তিষ্কে সেরোটোনিনের মাত্রা ঠিক থাকলে আচরণগত আগ্রাসন ও অতিরিক্ত রাগ নিয়ন্ত্রণে থাকে। মানসিক ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে বলে সেরোটোনিন-কে বলা হয় 'হ্যাপি হরমোন'। এছাড়া গামা অ্যামাইনো-বিউটারিক অ্যাসিড (GABA) নামক নিউরোট্রান্সমিটার-এর বিপাকীয় গোলযোগ কিংবা গ্লুটামিন অ্যাসিড থেকে উৎসারিত গ্লুটামিন-এর মাত্র মস্তিষ্কে হঠাৎ করে কমে গেলে রাগ নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হয়ে পড়ে।

অ্যাংগার ম্যানেজমেণ্ট বা রাগ নিয়ন্ত্রণের জন্যে কি কি থেরাপি উপযোগী?

অতিরিক্ত রাগ-কে বশ মানাতে যে সব থেরাপি কার্যকরী, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল - ১. অ্যাংগার সাপ্রেশন থেরাপি ২. কগনিটিভ বিহেভিয়র থেরাপি (CBT) ৩. হার্ট কোহেরেন্স ট্রেনিং ৪. কমিউনিকেশন স্কীল ইমপ্রুভমেণ্ট থেরাপি ৫. রিল্যাক্সেশন থেরাপি ৬. কগনিটিভ রিস্ট্রাকচারিং থেরাপি ইত্যাদি।

ক্লনিক্যাল সাইকোলজিস্ট বা কাউন্সেলিং সাইকোথেরাপিস্ট-এর তত্ত্বাবধানে এইসব থেরাপি-র সাহায্য নিয়ে অতিরিক্ত রাগ প্রশমনের প্রয়াস করা হয়। মনে রাখতে হবে, রাগ-কে যদি পজিটিভ এনার্জি-তে রূপান্তরিত করা যায়, তবে তা অনুপ্রেরণার উৎস হিসাবে কার্যকরী হতে পারে। মনোবিদ্যার গবেষকদের মতে রাগী লোকেরা যারপরণাই অপটিমিস্টিক বা আশাবাদী হয়ে থাকে। এদের মানবিক মূল্যবোধকে জাগ্রত করতে পারলে রাগের মাত্রা হ্রাস পেতে পারে। পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্কের বাঁধন সুদৃঢ় করে মাত্রাছাড়া রাগকে সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এছাড়া নেগোসিয়েশন স্ট্র্যাটেজি হিসাবে রাগ-এর ব্যবহার সুবিদিত। যেমন, রাগের মাধ্যমে প্রতিশোধ নেবার ইচ্ছা প্রশমিত হয়ে গেলে হিংসা-দ্বেষ, মারামারি-হানাহানি সংঘটিত হবার সম্ভাবনা কমে আসে।

আপনি নিজের রাগ কি কি উপায়ে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন?

১. রাগ যখন মাথায় চড়ে বসে, তখন ডিপ ব্রীদিং বা গভীরভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে শুরু করুন। ক্রোধের সময়কার বর্ধিত হৃদস্পন্দন, উচ্চ-রক্তচাপ ও নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের বেগবৃদ্ধি স্বাভাবিক করতে ডিপ ব্রীদিং অত্যন্ত ফলপ্রসু।

২. আপনি যখন খুব রেগে আছেন তখন মনে মনে ১০০ থেকে বিপরীতক্রমে ১ পর্যন্ত গুণতে শুরু করেন।

৩. মনকে শান্ত করতে ও ক্রনিক অ্যাংগার প্রশমিত করতে প্রিয় বন্ধুদের ফোন করুন, বাড়ীর সংলগ্ন কিচেন গার্ডেন-এ বাগান পরিচর্যা করুন, পছন্দের ভালো গান শুনুন, নৈতিক মূল্যবোধ সম্বলিত পুস্তক পাঠ করুন, মহাপুরুষগণের জীবনীগ্রন্থ পড়ুন, পারলে বসে যান রঙ-তুলি নিয়ে ছবি আঁকতে।

৪. এনার্জি বা শক্তিকে, যার যোগাসনের প্রভাবে রাগ হলে জল হয়ে যায়।

৫. রাগকে বাগে আনতে উইট, হিউমার ও হাস্যরসের চর্চা করুন। রম্যরচনা পড়ুন, টিভিতে সুস্থ রুচির হাস্যরসাত্মক বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান দেখুন।

৬. রাগের অন্যতম কারণ হল স্ট্রেস ও টেনশন। এই উদ্বেগ ও মানসিক চাপ থেকে মুক্তির নানান উপায় আছে। আপনি শিশুদের সঙ্গে সময় কাটান, শিশুসুলভ সরলতায় বন্ধুর মতো শিশুদের সাথে মিশলে আপনার স্ট্রেস ও অ্যাংজাইটি কেটে যাবে। বিভিন্ন ধরণের ধর্মীয় ক্রিয়াকর্মে যুক্ত থাকতে পারেন। সুন্দর মিষ্টি গন্ধ আমাদের মনে ভালো লাগার অনুভূতি

জাগায়। মানসিক চাপ কাটাতে তাই সুগন্ধির জুড়ি নেই। সেজন্যে টেনশন কমাতে অ্যারোমাথেরাপি বর্তমান যুগে বহুল সমাদৃত।

অতিরিক্ত রাগ নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন ধর্মে কি কি বিধান দেওয়া হয়েছে?

পবিত্র ধর্মগ্রন্থ গীতায় শ্রীকৃষ্ণ এক নিঃশ্বাসে উচ্চারণ করেছিলেন 'কাম-ক্রোধ-লোভ' শব্দবন্ধটি। যার মধ্যে ক্রোধ বা রাগ-কে তিনি সমস্ত পাপের উৎস ও ধ্বংসের কারণ বলে উল্লেখ করেছেন। এই রাগ হল 'রজো' গুণের অন্তর্গত। আমাদের জীবনে যখন ' রজো' ও 'তমো'-কে পরাস্ত করে 'সত্ব' গুণের প্রতিষ্ঠা হয় তখন রাগ পুরোপুরি বশে আসে। বৌদ্ধধর্মগুরু গৌতম বুদ্ধ রাগ-কে জয় করার জন্যে অষ্টপথ-এর কথা বলেছেন, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল সত্যদৃষ্টি, সত্যজ্ঞান, সদ্ব্যবহার, সত্য-অনুধ্যান, সৎ জীবন-যাপণ প্রভৃতি। ইসলাম ধর্মমতে অতিরিক্ত রাগকে 'তাৎক্ষণিক বাতুলতা' আখ্যা দিয়ে মারাত্মক রোগের পর্যায়ে ফেলা হয়েছে। প্রফেট মহম্মদ বলেছেন – 'আত্ম-সংরক্ষণ হল মানবজীবনের শ্রেষ্ঠতম নৈতিক সংগ্রাম। ভিনিগার যেমন মধুকে নষ্ট করে, রাগ তেমনি আমাদের বিশ্বাসকে নষ্ট করে। অনিয়ন্ত্রিত রাগ সব ধরনের অন্যায়ের দরজা খুলে দেয়।' ইসলাম ধর্মগুরু আরো বলেছেন --'খুব রেগে গেলে আপনি প্রথমে কথা বলা বন্ধ করুন। উন্মত্ত ক্রোধের সময় আপনি দাঁড়িয়ে থাকলে তৎক্ষণাৎ বসে পড়ুন। তাতে কাজ না হলে সটান চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ুন। তাতেও কাজ না হলে শাওয়ারের তলায় স্নান করে নিন। কিংবা কাছে-পিঠে পুকুর থাকলে কিছুক্ষণ সাঁতার কেটে আসুন। গীতায় বলা হয়েছে – আধ্যাত্মিক শক্তিকে সৃষ্টিশীল পথে পরিচালিত করতে পারলে আমাদের বিবেকবোধ জাগ্রত হয়। ঋকবেদে বর্ণিত গায়ত্রী মন্ত্র জপ করলে সত্য বুদ্ধি ও বিবেকবোধ জাগ্রত হয়, যা রাগ-কে বশীভূত করে।' ক্ষমা -র অবতার যীশুখ্রীষ্ট বলেছেন, স্বার্থপরতা ভুলে যান আর অন্যদের আন্তরিকভাবে ক্ষমা করতে শিখুন। দেখবেন আপনার রাগ গলে জল হয়ে গেছে।

অনিয়ন্ত্রিত রাগ থেকে উদ্ভুত অস্বাভাবিক আচরণের চিকিৎসা কিভাবে করা হয়?

অসংযত রাগ যখন মনোরোগের পর্যায়ে চলে যায় তখন ঔষধভিত্তিক চিকিৎসার প্রয়োজন হয়। মডার্ন মেডিসিন-এ মুড স্ট্যাবিলাইজার হিসাবে ব্যবহৃত বিশেষ বিশেষ ঔষধ বর্তমানে সাফল্যের সাথে ব্যবহৃত হচ্ছে।

লকডাউন ও মানসিক অবসাদ

করোনা মহামারীর আবহে সমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে পড়ছে মানসিক অবসাদ নামক গোপন মহামারী। ভয়ঙ্কর এই মনোব্যধির প্রকোপ থেকে কিভাবে পাওয়া যাবে মুক্তির পথ?

নভেল করোনা ভাইরাসের আকস্মিক প্রাদুর্ভাব বিশ্বজুড়ে মনুষ্যজাতিকে গৃহবন্দী করে ফেলেছে, যার পরোক্ষ প্রভাবে দেশে দেশে খাদ্যসংকট ও দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা শুধু সময়ের অপেক্ষা। সুদীর্ঘ লকডাউনের কারণে মানুষের সঞ্চয়টুকু শেষ, কোটি-কোটি মানুষ আজ কর্মহীন, বহু ছোট-বড় কোম্পানী কর্মী ছাঁটাইয়ের পথে হাঁটছে, দেশের অর্থনৈতিক পরিকাঠমো ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে। এমন ভয়াবহ পরিস্থিতিতে আপামর জনগণ কোনো রকমভাবে বেঁচে-বর্তে থাকার রসদ জোগাড় করার চেষ্টা করছেন যে যার সাধ্যমতো। লকডাউনে ঘরবন্দী শিশুরা হারাচ্ছে শৈশব, তাদের মধ্যে বাড়ছে মানসিক অসুস্থতা ও বিকার। চাকরী হারানোর ভয় ও সংক্রামক মারণ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু, ইত্যাদির ভয় থেকে বড়োরা আমরা অধিকাংশই প্রবলভাবে অবসাদগ্রস্ত। একে করোনায় রক্ষে নেই, সঙ্গে আবার দোসর বর্ণবিদ্বেষ, ধর্মীয় ঘৃণা আর সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের ভয়ঙ্কর ভাইরাস সমাজ-মননকে ঘুণপোকার মত কুরে কুরে খাচ্ছে। কয়েকদিন আগে বলিউডের উঠতি তারকা সুশান্ত সিং রাজপুতের আত্মহত্যা – আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে, টালমাটাল এই বিশ্ব-পরিস্থিতিতে মানসিক স্বাস্থ্যকে আর কোনোমতেই অবহেলা করা বুদ্ধিমানের পরিচয় নয়। মানসিক অবসাদের মহামারী ঠেকাতে মনস্তত্ত্ববিদ, মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ও মানসিক স্বাস্থ্যকর্মীদের পাশাপাশি স্বাস্থ্য-সচেতন শুভবুদ্ধিসম্পন্ন নাগরিক হিসাবে আমাদেরকেও সক্রিয়ভাবে এগিয়ে আসতে হবে।

মানসিক অবসাদের সাধারণ ও বিশেষ লক্ষণাবলী ঃ

(১) দৈনন্দিন কাজকর্মের আগ্রহ কমে যাওয়া। আনন্দ পাবার অনুভূতি ভোঁতা হয়ে যাবার কারণে কোনোকিছুই আর একদম ভালো লাগে না। সব কিছুতেই চূড়ান্ত হতাশা প্রবলভাবে গ্রাস করে। এক্ষেত্রে রোগীর মনের অবস্থা এতটাই নেতিবাচক হয়ে ওঠে যে তিনি বিশ্বাস করতে শুরু করেন, এই হতাশাব্যঞ্জক পরিস্থিতির আর কিছুতেই পরিবর্তন হবে না।

(২) আগের ভালো লাগা জিনিস এখন আর একদম ভালো লাগে না। প্রিয় বন্ধুদের এড়িয়ে চলে, নিজের শখের জিনিসের প্রতি আর আগ্রহ নেই, প্রিয় টিভি সিরিয়ালগুলোও আর দেখতেও বসে না। সবকিছুতেই খিটখিটে মেজাজ, বিরক্তিভাব, ভিতরে ভিতরে চূড়ান্ত অস্থিরতা গ্রাস করে। অসম্ভব ক্লান্তিভাব, কোনো কাজে অনেকক্ষণ মনঃসংযোগ রাখতে পারে না। জীবনের ঠিকঠাক সিদ্ধান্ত নিতেও ভুল করে বসে।

(৩) সারাদিন শুয়ে বসে কাটাতে মন চায়। ক্ষুধা ও পিপাসা কমে যায়। রাতে ছটফট করে, ভালো করে ঘুমাতে পারে না। নিজেকে অপদার্থ ভাবতে শুরু করা। রোগী বিশ্বাস করতে শুরু করে, তারই দোষে সংসারের আজ এই হাল। ভাবতে থাকে, আমি মরে গেলে সংসারে সবার কল্যাণ হবে, মঙ্গল হবে।

(৪) কেউ কেউ মৃত্যুচিন্তায় উদ্বেল হয়ে ওঠেন। ভাবেন, কোনোমতে এ পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে

পারলে আমার শান্তি। এই রোগীরা যখন অবসাদগ্রস্ত অবস্থা আর সহ্য করতে না পারেন, তখন তাঁরা সুইসাইডাল হয়ে পড়েন, আর তখন তাঁদের অস্থিরভাব হঠাৎ করে স্তিমিত হয়ে আসে। তখন এমনকি তাঁরা নিজের প্রিয় জিনিসটিও অন্যকে ডেকে নিয়ে দেন।

লকডাউনের ফলে মানসিক অবসাদ কাটিয়ে উঠবেন কিভাবে?

১. খবরের কাগজ, টেলিভিশন ও সোশ্যাল মিডিয়া থেকে অতিরিক্ত কোভিড-১৯ মহামারী সংক্রান্ত খবর ও তথ্য মাথায় ঢোকাবেন না। বিশ্বজুড়ে চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা করোনার প্রতিষেধক ও কার্যকরী ওষুধ আবিষ্কারের জন্যে প্রাণপাত করছেন। পাশাপাশি, ডাক্তার, নার্স ও সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্যকর্মীরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এই অতিমারীর প্রকোপ কমাতে ও আক্রান্ত রোগীদের সেবায় দিন-রাত এক করে কাজ করছেন। এই মহামারী প্রতিরোধে যারা এভাবে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন, তাঁদের সৎ ও নিষ্ঠাবান প্রচেষ্টার উপর ভরসা রাখুন এবং পরিবারের সবাই সঠিকভাবে এই সংক্রান্ত বিশেষ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন। অযথা উদ্বিগ্ন-বিষাদগ্রস্ত হওয়ার দরকার নেই।

২. সচেতন থাকার জন্য কেবলমাত্র বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য ও আপনার এলাকায় সরকারী স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থার বুলেটিনে প্রকাশিত নির্দেশিকাকে মান্য করুন। অসমর্থিত সূত্রের খবর ও সোশ্যাল মিডিয়া-র নানান আজগুবি গল্পে বিভ্রান্ত হবেন না। এভাবে সবকিছু মেনে চললে আপনি অযথা আতঙ্ক-গ্রস্থ হয়ে পড়বেন না।

৩. জীবনে এমন অনেক ঘটনা ঘটে, যা নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা আমাদের হাতে থাকে না। তবুও আমরা যদি অজানা-অসম্ভব সেইসব জিনিস নিয়ে ভাবতে বসি – তার দ্বারা সমাধান কিছু হবে না। উল্টে আমরা ভয়ের কবলে পড়বো, আমাদের মনের আকাশ ছেয়ে যাবে গভীর অবসাদের কালো মেঘে। পরিবর্তে আমরা নজর দেব স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত সেই সব কাজে, যা আমাদের করোনা রোগ প্রতিরোধে সাহায্য করবে। যেমন, বার বার সাবান দিয়ে হাত ধোওয়া, অ্যালকোহল-যুক্ত স্যানিটাইজার ব্যবহার করা, বাইরে বেরোলে মাস্ক পরা, ভিড় এড়িয়ে চলা, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা, ইত্যাদি।

৪. সবসময় নিজের শারীরিক স্বাস্থ্যের প্রতি যত্ন নিন ও মানসিক শক্তিকে উজ্জীবিত রাখুন। দৈনন্দিন রুটিন মেনে আপনি পুষ্টিকর খাবার খান, যোগ-ব্যায়াম ও প্রাণায়াম অভ্যাস করুন, নেশা-দ্রব্য ও অ্যালকোহল থেকে দূরে থাকুন, পর্যাপ্ত পরিমাণে ঘুমান, রুটিন-মাফিক কাজ করুন, সময় করে ভালো অনুপ্রেরণামূলক বই পড়ুন, সুস্থ রুচির হাস্যরসাত্মক ভিডি দেখুন, দিনের বেলায় এক ফাঁকে প্রকৃতির কোলে খোলা আলো-বাতাসে খানিকটা হেঁটে আসুন, সৃজনশীল কাজে আগ্রহ থাকলে তাতেও মনোনিবেশ করতে পারেন। এসব ঠিকঠাক করতে পারলে মনে অবসাদ চেপে বসবে না, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা প্রশমিত হবে, মন-মেজাজ থাকবে একদম ফুরফুরে।

৫. বাড়ীর বাইরে করোনা ও লকডাউনকে কেন্দ্র করে অনেক অপ্রীতিকর মর্মান্তিক ঘটনা ঘটছে, যা জানার ফলে আমাদের মনে নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে, আমরা প্রচন্ড হতাশায় ডুবে যাচ্ছি। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাদের বাড়ীর ভিতরের পরিবেশকে সে সবের প্রভাব মুক্ত রাখার চেষ্টা করতে হবে। না হলে গৃহের বিশৃঙ্খল পরিবেশ আমাদের মনকে সহজেই বিপর্যস্ত করে দেবে, যা থেকে বাড়ীর ছোট-বড় সবাই মানসিক অবসাদের শিকার হয়ে পড়বেন।

৬. করোনা-ভীতির আবহে এখনো অধিকাংশ ডাক্তারবাবুর ক্লিনিক বন্ধ। কিন্তু অনেক প্রতিষ্ঠান মানসিক অবসাদে আক্রান্ত রোগীদের অনলাইনে পরামর্শ দিচ্ছেন। বাড়ীর কোনো সদস্যের মধ্যে

টেনশন-মেন্টাল ডিপ্রেশনের লক্ষণ প্রকট হলে অবশ্যই টেলি-মেডিসিনের সাহায্য নিতে পারেন।

৭. যে কোনো রোগ সম্পর্কে আমাদের প্রবল ভীতি তখনই তৈরী হয়, যখন রোগটির ভয়াবহতা সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান অসম্পূর্ণ ও ভাসা-ভাসা থাকে। আমাদের দেশে বিশেষ করে এ রাজ্যে গত কয়েক মাসে করোনা চিকিৎসা-সংক্রান্ত পরিকাঠামো ও হাসপাতাল এবং পর্যাপ্ত কোয়ারেন্টাইন সেন্টার তৈরী করা হয়েছে। এই রোগের মৃত্যুহারও বেশী নয়। সুতরাং অযথা ভয়-বিহ্বল ও উদ্বিগ্ন হয়ে অবসাদগ্রস্ত হবার দরকার নেই।

৮. রোগ প্রতিরোধে শারীরিক দূরত্ব (ফিজিক্যাল ডিসট্যান্সিং) বজায় রাখুন। কিন্তু বন্ধুবান্ধব ও প্রিয়জনদের সঙ্গে সম্পর্কের বন্ধন অটুট রাখার চেষ্টা করুন। অবসাদ কমাতে অবসর সময়ে এদের ফোন করুন। মনের জোর বাড়াতে ইতিবাচক মানসিকতা-সম্পন্ন বন্ধুদের কাছে ফোন করে পরামর্শ নিন। মানসিক অবসাদ কাটাতে বরেণ্য মহাপুরুষের জীবনীপাঠ ও ধর্মীয় পুস্তক পাঠের চর্চাও আপনাকে সাহায্য করতে পারে।

৯. অবসরে বাড়ীর বড়োরা যখন চোখ রাখছে টেলিভিশন বা খবরের কাগজের পাতায়, তখন লকডাউনে ঘরবন্দী বাচ্চাদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে মোবাইল ফোন। এতে মোবাইল গেম-এ মজে ছোটরাও হয়ে পড়ছে প্রযুক্তির দাস, শিকার হয়ে পড়ছে অ্যাপের মাধ্যমে ঢুকে পড়া অনলাইন গেমের ভয়ঙ্কর বিপদের। বহু ছাত্র-ছাত্রী হাতে মুঠোফোন নিয়ে অনলাইনে স্কুলের ক্লাস করছে চার-ছয় ঘন্টা ধরে, অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে। এভাবে অত্যধিক মোবাইল ব্যবহারের কারণে ছোটদের মধ্যেও দেখা দিচ্ছে গোপন অবসাদ। স্কুলের বন্ধুদের সাথে দেখা না হওয়ার কারণেও ছেলে-মেয়েদের অনেকেই বেশ মনমরা। এভাবে বাড়ীতে ছোটোদের মুঠোফোনের নেশায় বুঁদ করে না রেখে, তাদের পছন্দের কিছু সৃজনশীল কাজ করতে উৎসাহিত করুন, বাড়ীর ছাদে বা সংলগ্ন উঠোনে তাদের সাথে খেলাধূলা করুন, বাড়ীর সবাইকে সঙ্গে নিয়ে হৈ-হৈ করে ঘর-বাড়ী পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করুন ও সুন্দর করে সাজান, বাড়ীর সংলগ্ন কিচেন গার্ডেন থাকলে পরিচর্যা করে শুরু করে দিন ফল-মূল-শাক-সব্জীর চাষ।

১০. সমাজসেবা-মূলক কাজে নিয়োজিত করার জন্যে মানসিক প্রস্তুতি নিলে ডিপ্রেশন থেকে নিজেকে দূরে রাখা যায়। করোনা বিপর্যয়ে, দেখা যাচ্ছে, মানুষের মধ্যে প্রবলভাবে ফিরে এসেছে মানবতার উচ্চারণ। সুপার সাইক্লোন আমফান ও লকডাউন পরবর্তী পরিস্থিতিতে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের বিবিধ সংকট সর্বব্যাপী। বন্ধু-বান্ধব ও সম-মনস্ক মানুষজনকে সঙ্গে নিয়ে বুভুক্ষু-নিরন্ন-সর্বহারা মানুষের কাছে আর্থিক সাহায্যের ডালি নিয়ে এগিয়ে যেতে পারেন। প্রত্যন্ত গ্রামে-গঞ্জে গিয়ে আপনি যখন দেখবেন, মানুষ কী অসহায় ও দূর্বিষহভাবে দিন কাটাচ্ছেন — আপনার অবসাদ নিমেষে উবে যাবে। তাঁদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়ে আপনি পাবেন মানসিক শান্তি। সবশেষে, আসুন সবাই মিলে প্রার্থনা করি, শীঘ্রই করোনার আঁধার কেটে গিয়ে বিশ্ববাসীর জীবনে আবার নূতন সূর্য্যের উদয় হোক।

Oyster India is a dedicated social organization formed by some like-minded people in many walks of life to make positive impact in our society. Empowering people for positive social transformation and helping people in such a way so that they can help themselves in the long run. We want to make our society free from violence, corruption, cultural degradation and social injustice.

Oyster India

Social Work | Environment Protection
Personality Development | Mental Health
Essay Competition | Women Empowerment
Health Awareness Drive | Relief Operations
Value Education Training | Charity

Website: www.oysterindiatrust.com
E-mail: oysterindiatrust@gmail.com
Facebook Group: Value Today
YouTube Channel: Oyster India Value Today

Helping Hands for Humanity...